চার দেওয়াল

সাগর কোড়াইয়া

ছুটিতে বাড়িতে গেলে বন্ধুদের সাথে আড্ডা হয়। একবার কথার ফাঁকে রুমির প্রসঙ্গ উঠতেই ঠিকানা জোগাড় করলাম। সময় করে একদিন রুমির বাড়ির সামনে গিয়ে মোটর সাইকেল দাঁড় করিয়ে গেটে শব্দ করি।

দশ বারো বছরের একটি মেয়ে বের হয়ে এলো। মেয়েটি অবিকল রুমির মতো দেখতে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি রুমির মেয়ে? মেয়েটি আমার কথা শুনে বুঝি খুশি হলো। বললো, মা তো রান্না করছে। আমি বললাম, একটু ডেকে দাও তো।

একটু পর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে রুমি বেরিয়ে এলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো রুমি।

রুমি যে আমাকে চিনতে পারবে না কল্পনায়ও ভাবিনি। তবে এক দেখাতেই ওকে চিনতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। পরিচয় দিতেই বেশ ক্ষাণিক নীরব থেকে বললো, চিনে না। ভাবলাম, হয়তো প্রায় বিশ বছর পর দেখা তাই চিনতে পারেনি।

আমি শুকনো হাসি দিয়ে বললাম, এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে?

সেই চেনা মুচকি হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললো, মাঝে মাঝে আমি নিজেকেই ভুলে যাই। আর আপনাকে মনে রাখার কোন প্রশ্নই আসে না।

আমিও নাছোড়বান্দার মতো জিজ্ঞাসা করলাম, আসলেই চিনতে পারোনি?

আমার কথা শুনে রুমি বললো, আমিতো আপনাকে বলেইছি, চিনতে পারিনি। আর আপনাকে কোথাও দেখেছি বলেও তো মনে পড়ে না।

কোন ছেলে নিজে থেকে পরিচয় দেবার পরও কোন মেয়ে যদি বলে, চিনতে পারিনি। তাহলে ঐ ছেলের জীবনে এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু আছে কিনা আমার জানা নেই। নিজেকে কি বলে সান্ত্বনা দেবো বুঝলাম না। অবশেষে এই সান্ত্বনাই আমার জন্য যথাযথ বলে মনে হলো যে, আমার চেহারা হয়তো আমূল পাল্টে গিয়েছে তাই রুমি চিনতে পারছে না।

রুমির সাথে স্কুল জীবনে সম্পর্কটা ছিলো বেশ মধুর। মেট্রিকে আমার আগেই ওর রোল ছিলো। বরাবরই একটু অন্তর্মুখী স্বভাবের ও। জিজ্ঞাসা করলে বেশ গুছিয়ে কথা বলা শিখে গিয়েছিলো তখনই। তবে নিজে থেকে কখনো কথা বলতো না।

গায়ের রং টকটকে ফর্সা না হলেও উজ্জ্বল বর্ণেরই বলা যায়। নাকটা উঁচু নয় তবে মায়াবী একটা রূপ আছে তাতে। রুমির বাবার ডাক্তারি পেশার কারণে বাজারের পাশেই বাসা ভাড়া করে থাকতো ওরা। স্কুলের ছেলেরা ওর সাথে কথা বলতে ভয় পেতো। আমাদের সাথে বেলাল নামে একজন পড়তো। বেলাল ছিলো একটু পাগলাটে স্বভাবের। রুমিকে ও পছন্দ করতো খুব।

রুমিকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েও কোন কাজ হয়নি। তবু বেলাল ছিলো নাছোড়বান্দা। রুমি উপায়ন্তর না পেয়ে হেড স্যার বরাবর লিখিত অভিযোগ জানায়। একদিন ক্লাস শুরু হওয়ার আগে সবার সামনে হেড স্যার বেলালকে উত্তম মাধ্যম প্রদান করেন। আর তাই দেখে ছেলেমেয়েদের একসাথে কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়।

অবশেষে বেলাল রুমির প্রতি ইস্তফা দিয়ে ওর ছোট বোনের সাথে প্রেম করা শুরু করে। সেখানে অবশ্য শতভাগ সফল।

সেদিন রুমির সাথে আর কথা হয়নি। ও মেয়েকে নিয়ে ভিতরে চলে যায়। আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকি। ফিরে আসার সময় ভাবলাম, আমি হয়তোবা অন্য কোন রুমিকে দেখেছি। এরপর সব কিছু ভুলে গেলাম।

আমরা যারা একসাথে মেট্রিক পাশ করেছি তাদের মধ্যে যোগাযোগ একটু কম হয় বললেই চলে। যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য বন্ধুরাখী নামে হোয়াটস্অ্যাপ পেজ খুলেছে আমাদের বন্ধু সুবির। নিয়মিত একে অপরের সাথে যোগাযোগ বেশ ভালোই হয়। মেট্রিক পাশের বিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে পূনর্মিলনের আয়োজন করে সুবির।

পূনর্মিলন অনুষ্ঠানের কয়েকদিন আগে থেকে বন্ধু সুবিরের চোখে ঘুম নেই। বারবার আমাকে কল করে বলে, বন্ধুরা সবাই আসবে তো?

সুবিরকে সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে বলি, চিন্তার কিছু নেই। দেখবে সবাই আসবে।

অনুষ্ঠানের দিন সকাল থেকে স্কুল প্রাঙ্গণে এসে হাজির সবাই। বিশ বছর পর দেখা। সবার সাথে কুশলাদি বিনিময় করলাম। সবার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। কারো চুলে পাক ধরেছে তো কারো মাথা অর্ধেক ফাঁকা। আর সবার শরীরের স্থূলতা সুখ আর মোটা আয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে। সবাই স্ত্রী নিয়ে এসেছে। তবে সবার সাথে আমার এক জায়গায় পার্থক্য; আমি বিয়ে না করার অঙ্গীকার করেছি।

সব কিছুর ফাঁকে রুমিকে খুঁজছিলাম। কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। রুমির আশা ত্যাগ করে অনুষ্ঠানে মনোযোগী হলাম। ততক্ষণে সময় গড়িয়ে গিয়েছে। হঠাৎ গেটের দিকে চোখ পড়তেই দেখি রুমি ঢুকছে। শাড়িটা ওর শরীরে মানিয়েছে বেশ। উঠে ওর সামনে যাবো কিনা ভাবছি। দেখি রুমিই আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, কেমন আছ?

আমি হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। কি জবাব দিবো বুঝতে পারছিলাম না। এ কোন রুমি! কয়েকদিন আগেও যে আমাকে চিনতে পারলো না সেই আজ নিজে থেকে কথা বলছে।

ভাবলাম, রুমির প্রশ্নের কোন উত্তর দিবো না। খুব রাগ হলো আমার। এরই মধ্যে অন্যরা এসে ওকে ধরলো। 'এতো দেরী করলি কেন' ধরনের উত্তরে জর্জরিত অবস্থা তখন ওর।

অনুষ্ঠানের একফাঁকে রুমির সাথে দেখা। সবাই যার যার কাজে ব্যস্ত তখন। ওর সাথে কথা বলবো না ভেবে যেই ওকে পাশ কাঁটিয়ে যাচ্ছিলাম ও বললো, শোন, তোমার সাথে কথা আছে।

আমি নীরব দর্শকের মতো দাঁড়ালাম।

কোন প্রকার ভণিতা না করে রুমি বললো, সেদিনের ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত। আমার কোন দোষ ছিলো না। তুমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিলে আর তোমাকে চিনবো না তাই কি হয়। তুমি হয়তো খেয়াল করোনি আমার স্বামী সে সময় ছাদে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিলো।

আমি রুমির দিকে তাকালাম। দেখি ওর কালো চোখ দুটিতে ভীরুতার ছাপ স্পষ্ট। আমি বললাম, তোমার স্বামী দেখলে তাতে কি হলো?

তুমি জানো না, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে যোগাযোগ রাখা বন্ধ। বিয়ের পর আমিতো এরপর আর পড়াশুনা করতে পারিনি। চার দেওয়ালের মাঝখানে যেন বন্দি অবস্থার মধ্যে আছি। দুই কন্যা নিয়ে আছি কোন মতে। তবে মনে হয়, প্রতিদিন অভিনয় করছি।

তবে আজ এলে কেমন করে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

বাবা অসুস্থ। কয়েকদিন ধরে আমাকে দেখতে চাচ্ছিলো। স্বামী ব্যস্ত থাকায় আসতে পারেনি। তবে সিএনজিতে তুলে দিয়েছে। বাবার সাথে দেখা করে তবে এখানে এসেছি।

রুমির কথা শুনে ওর জন্য আমার খুব মায়া হলো। ইতোমধ্যে অন্যরা এসে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে। রুমির সাথে কথা আর বেশি দূর এগুইনি। তবে এটা আমার কাছে স্পষ্ট যে, রুমির পৃথিবীটা চার দেওয়ালের মধ্যেই আটকে আছে॥

বাম হাত

প্রদীপ মার্সেল রোজারিও

একটি মাল্টি-ন্যাশনাল কোম্পানীতে কাজ করার সুবাদে সিঙ্গাপুরে এসেছি ছয় মাস হতে চললো। এখানে আমাকে মোটামুটি এক বছর কাজ করতে হবে। তারপর কোথায় পোষ্টিং হবে জানি না। বিশ্বখ্যাত হাসপাতাল মাউন্ট এলিজাবেথের পাশেই আমাদের অফিস। মাউন্ট এলিজাবেথের গ্রাউন্ড ফ্লোরের কর্নারে একটি পরিপাটি স্ন্যাক্স-শপ আছে। প্রতিদিন অফিস শেষে আমি এ স্ন্যাকস-শপটিতে আসি কফির স্বাদ নিতে। কফির পাশাপাশি হালকা ফাস্ট-ফুড আইটেমের স্বাদও গ্রহণ করি মাঝে-মধ্যে।

কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে স্ন্যাকস-শপে আগত মানুষ দেখি। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকে আগত মানুষ, বৈচিত্রে ভরপুর মানুষ। পরিধেয় পোশাক এবং চেহারায় কতই না বৈচিত্র! মাঝে-মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আগতদেরও দেখি। এরা উচ্চ মহলের লোক। আমার স্ট্যাটাসের সাথে যায় না, তাই এড়িয়ে চলি।

এই স্ন্যাকস-শপেই আমার স্কুল-জীবনের বন্ধু রূপমের সাথে দেখা। সাথে স্ত্রী এবং ছেলে। আলাপ করে জানতে পারি ইতোপূর্বে ও'রা আরও দুইবার এ হাসপাতালে এসেছে। ছেলের চিকিৎসা চলছে এ হাসপাতালে।

কলেজে ভর্তি হওয়ার পর রূপমের সাথে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাই রূপম কি করে, কোথায় থাকে তা আমার অজানা ছিল। তবে বেশ বুঝতে পারি রূপম এখন উচ্চ-মহলের লোক হয়ে গেছে। কতটা আর্থিক সামর্থ্য থাকলে মাউন্ট এলিজাবেথের মতো হাসপাতালে ছেলের চিকিৎসা করানো যায় তা বোঝার জন্য খুব একটা জ্ঞানের অধিকারী হতে হয় না।

কিরে দোস্ত, কী এতো ভাব্‌ছিস্? মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে ছেলের চিকিৎসা করানোর সামর্থ্য আমার হলো কীভাবে? তা ভাব্‌ছিস তো? এটা পরিচিতদের মধ্যে সকলেরই ভাবনা। আমরা বাঙালিরা নিজেদের তুলনায় অন্যদের নিয়ে ভাবতে পছন্দ করি। তুই তো আমার ছোট বেলার বন্ধু। এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে নিয়ে ভাববে এটাই তো স্বাভাবিক। শোন দোস্ত, তোকে আমি সব বলবো। আমার অর্থবিত্তের মালিক হওয়া, ছেলের অসুস্থতা- সব বলবো। তবে আজ নয়। আজ আমাদের তাড়া আছে। আগামীকাল সন্ধ্যায় তুই আমার হোটেলে চলে আয়। আমরা পাশেই গুডওডপার্ক হোটেলে উঠেছি। একসাথে ডিনার করতে করতে তোকে সব বলবো।

হোটেলের নাম শুনে আমার ভিমড়ি খাবার যোগাড় হয়। আমি সহজেই হোটেলটি চিনতে পারি। সিঙ্গাপুরের প্রথম সারির হোটেলের তালিকায় গুডওডপার্ক-এর নাম প্রথম দিকে আছে। আমাকে প্রতিদিন এ হোটেলটির পাশ দিয়ে অফিসে যেতে হয়। পাছে মন খারাপ হয় এ ভয়ে আমি এ হোটেলটির দিকে তাকাইও না ঠিক মতো। নিজেকে যতটা সম্ভব সামলে নিয়ে রূপমকে বলি, আসবো দোস্ত, আসবো।

পরের দিন রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটি। ডিনারের সময়ের বেশ আগেই আমি হোটেলে পৌঁছাই, হোটেলের ভেতরটা ভালোভাবে দেখার আশায়। হোটেলের লবিতেই রূপমের সাথে আমার দেখা হয়ে যায়। লবিতে বসে রূপম কফি পান করছে। বউ আর ছেলে সাথে নেই। আমাকে দেখে রূপম উল্লসিত হয়ে ইশারায় ও'র পাশে বসতে বলে।

রূপম আমার জন্য কফির অর্ডার দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে- প্রতিদিন আমি দু'কাপ কফি পান করি। সকালে এক কাপ আর বিকালে এক কাপ। তোর ভাবির কফি পানের অভ্যাস নেই। তুই আগে আসাতে ভালোই হলো। কফি পান করতে করতে আমার ছেলের অসুস্থতাসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলাপ করা যাবে।

আমি একটু আগে এসেছি হোটেলের ভেতরটা ভালোভাবে দেখার জন্য। আমাদের তো এ ধরনের হোটেলের ভেতরে ঢুকার সুযোগ হয় না। তোকে এভাবে লবিতে পেয়ে যাবো ভাবিনি। তবে ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তোর আলাপ করার ইচ্ছে না থাকলে করিস না। আমরা বরং অন্য বিষয় নিয়ে কথা বলি। কফিতে চুমুক দিতে দিতে আমি বলি।

না-রে দোস্ত, এটা আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় নয়। এটা আমার ছেলের চিকিৎসার অংশ। ডাক্তারের পরামর্শে আমাকে এটা করতে হচ্ছে। শুধু তোর সাথে নয়, আমার পরিচিত আরও অনেকের সাথে আমাকে ছেলের চিকিৎসার বিষয়টি শেয়ার করতে হবে। তাহলে শুরু করি, কি বলিস?

আমি চুপ করে থাকি। ভাবি এ কেমন রোগ? চিকিৎসাই-বা কেমন? মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ভেবে রূপম বলা শুরু করে।

আমি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মধ্যম গ্রেডের কর্মকর্তা হিসাবে কাজ করি। প্রতিষ্ঠানটিতে দৈনিক বিশাল-অংকের আর্থিক লেনদেন হয়। প্রতিষ্ঠানটি শুরুর পর বেশ কয়েক বছর ভালোই চলছিলো। কিন্তু ক্ষমতা পরিবর্তনের পর নতুন নেতৃত্বের অর্থ এবং ক্ষমতার লোভের কারণে প্রতিষ্ঠানটি অল্প সময়ের মধ্যে একটি সুসংগঠিত দুর্নীতিবাজদের আড্ডাখানায় পরিণত হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি টাকার জোরে সংশ্লিষ্ট সকল মহলকে আয়ত্ত্বে রেখে দুর্নীতিবাজদের নেতৃত্ব প্রদান করেন। আমি প্রতিষ্ঠান-প্রধানের একমাত্র বিশ্বস্ত কর্মী। প্রতিষ্ঠান-প্রধান তার সকল দু-নম্বরী কাজ আমাকে দিয়ে করায়। নিজে করে না। প্রতিটি কাজে আমি ভাগ পাই, আবার চোরের উপর বাটপারীও করি। প্রতিদিন আমার হাতে প্রচুর টাকা আসে। মাসের বেতন ছুঁয়েও দেখি না। এভাবে অল্প সময়ে অঢেল অর্থ-বিত্তের মালিক বনে যাই আমি। সমাজে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

স্বামীর আর্থিক সামর্থ্য এবং মর্যাদা বৃদ্ধি পেলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাজে স্ত্রীর মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। রাতারাতি তোর ভাবি অনেকগুলো সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন সম্মানজনক পদে আসীন হয়। প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অথবা অন্যতম বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করতে হয় তাকে। এ ব্যস্ত জীবন তোর ভাবি খুব উপভোগ করে। সামাজিক কর্মকাণ্ডে তোর ভাবির এ সম্মানজনক উত্থান আমাকে দু-নম্বরী কাজ করতে আরও বেশি উৎসাহিত করে। আমি বিপুল বিক্রমে দু-নম্বরী করতে থাকি।

তুই কি অস্বস্তিবোধ করছিস্? করলেও কিছু করার নেই। আমাকে বলতেই হবে। এবার ছেলের অসুস্থতার কথা বলি। ও, ছেলের নামই তো বলা হয়নি। আমার ছেলের নাম অয়ন। সাত বছর বয়স পর্যন্ত অয়নের কোন সমস্যা ছিলো না। অন্য দশটি শিশুর মতো ও' বেড়ে উঠছিলো। আচার-আচরণসহ শারীরিক কোন সমস্যা ছিলো না। সমস্যা শুরু হয় সাত বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর থেকে। সমস্যাটি হলো- ধনী, গরীব, আত্মীয়, শিক্ষক, সহপাঠী, পরিচিত, অপরিচিত যে কেউ অয়নের কাছে আসলে অয়ন ও'র বাম হাত বাড়িয়ে দেয়। কিছু একটা চাওয়ার ভঙ্গিতে এমনভাবে হাতটি

বাড়ায় যেন ও'র কিছু একটা পাওয়ার কথা। সবচেয়ে বিপদজনক বিষয় হলো অয়ন যখন কারো উদ্দেশে হাত বাড়ায় তখন ও'র চোখে-মুখে একটা চোর চোর ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছেলে পরিচিত-অপরিচিত যাকেই দেখছে তার উদ্দেশেই চোর চোর অবিব্যক্তি নিয়ে কিছু একটা পাওয়ার আশায় হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে- অবিরাম এমন ঘটনা ঘটলে তা কোন বাবা-মা'র পক্ষে সহ্য করা কি সম্ভব? তুই হয়তো খেয়াল করিস্‌নি, গতকাল স্ন্যাক্স-শপে টেবিলের নীচ দিয়ে অয়ন দুইবার তোর দিকে বাম হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তৃতীয়বার আমি ও'র হাত ধরে ফেলেছিলাম, আর ছাড়িনি।

দেশে নামকরা সাইকিয়াট্রিস্টদের দেখিয়েছি। সমস্যা ধরতে পারেনি তাই সমাধানও হয়নি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারি মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে শিশুদের আচরণসংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে কাজ করেন এমন একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক আছেন। কাজ করেন কথাটা বললাম কারণ তিনবার ও'নার নিকট এসে বুঝলাম উনি কাজ করেন এবং করান। গতানুগতিক ধারার চিকিৎসা বলতে আমরা যা বুঝি তিনি তা করেন না। এবার নিয়ে আমরা তৃতীয়বার ডাঃ লি চ্যাং-এর নিকট আসলাম। প্রথম বার প্রায় দুই ঘন্টা ডাঃ লি আমাদের সময় দিয়েছেন। আমাদের নিকট থেকে সব শুনে এবং ছেলের সমস্যাটি সরেজমিনে দেখার পর তিনি আমাদের কিছু লিখিত প্রশ্ন দিয়ে সেগুলোর লিখিত উত্তর নিয়ে দুইমাস পরে আমাদের আসতে বলেছেন। উত্তর যত অপ্রিয়ই হোক তা লিখতে বলেছেন। সত্য লুকানো হলে সঠিক চিকিৎসা করাটা সম্ভব হবে না বলে আমাদেরকে বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া আমাদের জন্য খুবই বিব্রতকর ছিলো। লজ্জাজনকও ছিলো বটে। কিন্তু ছেলের অসুস্থতা বলে কথা। আমরা আমাদের পক্ষে যতটা সম্ভব সঠিক উত্তর লিখে ডাঃ লি-এর সাথে দেখা করি। উত্তর পড়ে ডাঃ লি খুশী হন। বলেন- আমি বুঝতে পেরেছি, আপনারা আপনাদের ছেলেকে কতটা ভালোবাসেন। আপনারা কোনো কিছু না লুকিয়ে সঠিক উত্তরই লিখেছেন মনে হচ্ছে। আপনারা সঠিক উত্তর দেয়ায় আমার কাজটা সহজ হয়ে গেল। আপনারা তিন মাস পরে আসবেন। এ তিন মাস আমি আপনাদের ছেলের সমস্যা এবং আপনাদের উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করবো। বিশ্লেষণ শেষ করে আমি আপনাদের ছেলের সমস্যা সমাধানের জন্য করণীয় নির্ধারণ করবো। তিন মাস পরে আসলে আমি আপনাদের সব বুঝিয়ে দেবো। করণীয়গুলো মেনে চললে আমার বিশ্বাস পরবর্তী এক বছরের মধ্যে আপনাদের ছেলের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে।

তিন মাস পর এবার তৃতীয়বার আসলাম। গতকাল সন্ধ্যায় ডাক্তারের সাথে দেখা করেছি। তিনি আমাদের করণীয় বুঝিয়ে দিয়েছেন। সব কাজ আমাদের, ছেলের কোন কাজ নেই। কারণ ছেলের অসুস্থতার জন্য আমরা বাবা-মা দায়ী। ডাক্তার বলেছেন, যত তাড়াতাড়ি আমরা উনার নির্দেশনাগুলো মেনে চলা শুরু করতে পারবো তত তাড়াতাড়ি আমাদের অয়ন সুস্থ হয়ে উঠবে। তোর নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে, আমার ছেলের অসুস্থতার কারণ কী? আবার আমাদের করণীয়ই বা কি? বলবো দোস্ত, বলবো। আমাকে বলতেই হবে। কারণ অন্যদের সাথে সহভাগিতা করাটাও ডাক্তারের উপদেশের মধ্যে পড়ে। আমার দিকে খানিকটা সরে এসে রূপম পুনরায় বলা শুরু করে।

আমি মনে করতাম ডান হাত পবিত্র তাই ডান হাত দিয়ে দু-নম্বরী কাজ করা ঠিক নয়। তাই যত দু-নম্বরী কাজ অর্থাৎ লেনদেন আমি বাম হাত দিয়ে করতাম। এ দু-নম্বরী লেনদেনগুলো অধিকাংশই আমার বাসায় হতো, ছুটির দিনে। ছেলে ছোট ছিলো। ছেলেকে পাশে বসিয়ে বাম হাত দিয়ে লেনদেন করতাম। লেনদেন বলতে শুধু নিতাম, কিছু দিতে হতো না। অধিকাংশ সময় টেবিলের উপর দিয়েই নিতাম। মাঝে মাঝে টেবিলের নীচ দিয়ে হাত বাড়িয়ে নিতাম। নেয়ার সময় আমার চোখে-মুখে একটা চোর চোর ভাব ফুটে উঠতো। মানসিক বিকাশের মূল সময়টায় আমার ছেলে অয়ন দিনের পর দিন আমার পাশে বসে অবলোকন করেছে যে, আমি কিছু নেয়ার সময় প্রতিবার বাম হাত ব্যবহার করছি। কিছু নেয়ার সময় আমার চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠা চোর চোর ভাবটিও অয়নের নজর এড়ায়নি। আমার এ দু-নম্বরী আচরণটি অয়নের মনোজগতকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে এবং ধীরে ধীরে ও'র আচরণে নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটায়।

অয়নের এ সমস্যাটি শুধুমাত্র আমার কারণে হয়েছে তা কিন্তু নয়। এতে ও'র মায়েরও ভূমিকা আছে। বাবার পাশাপাশি মা'দের আচার-আচরণও সন্তানের উপর প্রচণ্ডভাবে প্রভাব ফেলে। আমার মা অর্থাৎ অয়নের ঠাকুরমা মৃত্যুর পূর্বে বেশ কয়েক বছর আমার বাসায় ছিলো। মা আমার বাসায় থাকুক এটা তোর ভাবি মোটেও পছন্দ করতো না। প্রায় প্রতিদিনই মায়ের ব্যাপারে কোন না কোন অভিযোগ তোর ভাবির নিকট থেকে আমাকে শুনতে হতো। মা'র জন্য যা-ও সামান্য কিছু সে করতো প্রচণ্ড বিরক্তি নিয়ে করতো। মা'র সাথে ভালোভাবে দু'টো কথা পর্যন্ত বলতো না। মা সব বুঝতো, আমিও বুঝতাম। আমরা সহ্য করতাম। সবচেয়ে খারাপ বিষয়টি হলো, তোর ভাবি আমার মাকে ডান হাত দিয়ে কিছু দিতো না। মাকে কিছু দেয়ার সময় সে বাম হাত ব্যবহার করতো। এভাবে মাকে তার ঘৃণাটা বুঝাতে চাইতো। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের অনুষ্ঠানে তোর ভাবি সেবার চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ করা এবং তা অনুশীলন করা সম্পর্কিত জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করতো অথচ বাসায় এসে নিজেই তা অনুশীলন করতো না। ভণ্ডামীর এক জ্বলন্ত উদাহরণ হলো তোর ভাবি। এক বুক কষ্ট নিয়ে মা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমার বাসায়ই ছিলো। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব মা'র চিকিৎসা করিয়েছি, সেবা করেছি। মায়ের প্রতি তোর ভাবির এ রূঢ় আচরণ এবং দিনের পর দিন বাম হাত দিয়ে জিনিস দেয়ার ঘটনাগুলো অয়নের মনোজগতে সাংঘাতিকভাবে প্রভাব ফেলে। অয়নের আজকের এ অবস্থার জন্য আমরা বাবা-মা উভয়ে কিভাবে দায়ী এবং কিভাবে এ সমস্যার সমাধান হবে, ডাক্তার তা অংক করে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। সামনের টি-টেবিলে থাকা পানির গ্লাসে চুমুক দিয়ে রূপম আবার বলা শুরু করে ।

এবার আমাদের করণীয় সম্পর্কে তোকে খানিকটা ধারণা দেই। দেশে ফিরে গিয়ে আমাকে সকল দু-নম্বরী কাজ ছেড়ে দিতে হবে। যতটা সম্ভব অসহায় মানুষকে দান করতে হবে। আর এ দান করতে হবে ডান হাত দিয়ে, হাসিমুখে, ছেলেকে পাশে নিয়ে। আর তোর ভাবিকে অসহায়, বৃদ্ধাদের বাসায় নিয়ে এসে নিয়মিত খাওয়াতে হবে, সেবা করতে হবে। মাঝে মাঝে বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েও সেবার কাজ করতে হবে। আর এ সকল কাজ করবে ডান হাত দিয়ে, অয়নের সামনে।

তোরা কবে দেশে ফিরে যাবি? দেশে ফিরে কিভাবে শুরু করবি ভাবছিস? আমি জিজ্ঞেস করি।

আগামীলকাল হাসপাতালে আমাদের কিছু কাজ আছে। কাজগুলো শেষ করে পরশুদিন আমরা দেশে ফিরে যাবো। দেশে ফিরে প্রথমেই আমি চাকুরী থেকে অব্যাহতি নেবো। এ চাকুরীতে বহাল থেকে আমার পক্ষে কোনভাবেই দু-নম্বরী কাজ থেকে নিজেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে না। অতঃপর দান করা শুরু করবো। আর মাকে তো ফিরিয়ে আনা যাবে না। তাই মায়ের কবরে গিয়ে আমি আর তোর ভাবি মায়ের নিকট করজোড়ে ক্ষমা চাইবো। মা তো মা, নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

আমি রূপমের চোখে-মুখে হঠাৎ একটি আলোর ঝল্‌কানি দেখতে পাই। আলোটি ও'র সৎ পথে ফেরার তীব্র আকাঙ্ক্ষার নাকি ছেলে সুস্থ হয়ে উঠবে সে আশার, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামানোর প্রয়োজনবোধ করি না॥ ❑

সন্দেহের আগুনে জ্বলছে নির্ণয়

সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ

নির্ণয় বাবা- মায়ের একমাত্র অতি আদরের সন্তান। বাবা নিথর প্রবাসে থেকে সন্তানের জন্যে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বহু কষ্টে অর্থ উপার্জন করছে, অন্যদিকে মা নিতিয়া নির্ণয়ের শিক্ষার জন্যে, গঠনের জন্যে যা কিছু করণীয় সবই করছে, ছেলের জন্যে প্রতিনিয়ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। নির্ণয় খুবই ভালো, নম্র, ভদ্র, অমায়িক ও টেলেন্টেড ছেলে। বাবা-মা, আত্মীয় পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশি, শিক্ষক-গুরুজন, বন্ধু-বান্ধব সবার অতি প্রিয় নির্ণয় গ্রামের একটি স্বনামধন্য স্কুলে পড়ালেখা করে এসএসসি পাশের পর শহরে একটি নামকরা কলেজে ভর্তি হয়। কলেজে পড়ার সময় পার্শ্ববর্তী কলেজে অধ্যয়নরতা নির্জনার সাথে তার পরিচয়, বন্ধুত্ব এবং শেষে প্রেম হয়। নির্জনা খুবই সুন্দরী, বুদ্ধিমতি, বুদ্ধির দিক দিয়ে নির্ণয়কে ছাড়িয়ে। সে খুব কম কথা বলে, নামের সাথে আচরণের সার্থকতা রয়েছে। নির্জনার ঘন কালো লম্বা চুল, চরিত্রের দৃঢ়তা, তার প্রশান্ত গাম্ভীর্য ভাব নির্ণয়কে মোহিত করে। তবে যার জন্যে নির্ণয়ের সাথে পাল্লা দিতে গিয়ে পিছিয়ে পড়বে, তা হলো নির্জনার আর্থিক অস্বচ্ছলতা। তার বাবা একজন সামান্য বেতনের স্কুল শিক্ষক। অতি কষ্টে তাদের সংসার চলে, নির্জনার পড়ালেখার ব্যয় নির্জনা নিজেই বহন করে টিউশনি করে। নির্জনার সুন্দর আচরণ, মধুর ব্যবহার আর দৈহিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে নির্ণয় তাকে ভালোবেসে ফেলে, কিন্তু নির্জনা প্রথমে কিছুতেই নির্ণয়ের ভালোবাসাকে পাত্তা দেয়নি, কারণ দু'জনের মধ্যে আর্থিক দিক দিয়ে অনেক ব্যবধান। নির্জনার মনে কোন উচ্চাশা নেই, তার স্বপ্ন পড়ালেখা শেষ করে, চাকুরী করবে, বাবা-মায়ের দুঃখ দূর করবে, মানুষের মত মানুষ হবে, বাঁচার মত বাঁচবে। তার ছোট দু'বোনকে পড়াশোনা করিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবে।

কোন এক সময়ে নির্ণয়ের একাগ্রতা, অসীম ধৈর্য্য ও অকৃত্রিম ভালোবাসার কাছে বাঁধা পড়ে যায় নির্জনা। নির্ণয়ের বাবা মা তাদের এ ভালোবাসাকে কিছুতেই স্বীকৃতি দেয়নি, কারণ নির্জনা দরিদ্র, তাদের আত্মীয় স্বজন ও পরিবারের সাথে নির্জনার আত্মীয় স্বজন ও পরিবারকে মানায় না। নির্ণয় বাবা-মাকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বাধ্য হয়ে বিকল্প পথ অবলম্বন করে। একমাত্র ছেলে হওয়ায় অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বাবা মা এ বিয়েকে মেনে নেয় এবং নতুন বৌমাকে ঘরে তুলে। সমাজের সাথে আলোচনা করে ফাদারের সাহায্যে গির্জায় বিয়ে সম্পন্ন করে। নির্জনা শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে নিজের বাবা মায়ের মত শ্রদ্ধা করতে থাকে এবং তার সুন্দর ব্যবহার ও কাজকর্ম করে অল্প সময়ের মধ্যেই সবার মন জয় করে ফেলে। নির্ণয়ের বাবা-মা-ও নির্জনাকে নিজেদের মেয়ের মতই ভালোবাসতে ও আদর করতে থাকে। শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ও আত্মীয়দের আদর যত্ন ও নির্ণয়ের অসীম ভালোবাসায় নির্জনা অত্যন্ত খুশী হয় এবং সুন্দর পরিবার গঠন করে।

ইতিমধ্যে পড়াশোনা শেষ করে নির্ণয় ঢাকায় ভাল চাকুরী পেয়েছে। বাবা নিথর বিদেশের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে দেশে একটি চাকুরী করছে। নির্ণয় না চাইলেও নির্জনা বাড়ীতে থেকে তিনটি টিউশনি করে নিজের হাত খরচ যোগার করছে। দু'জনের চাকুরী ও একজনের টিউশনির টাকায় স্বচ্ছলভাবেই চলে যাচ্ছিল তাদের সংসার। শশুর-শ্বাশুড়ী নির্জনাকে বারে বারে তাগাদা দিচ্ছিল তাদের জন্য নাতী-নাতনী এনে দেবার জন্যে। নির্জনা অতি আনন্দ নিয়ে একদিন শ্বশুর শ্বাশুড়ীকে সুসংবাদটি দিলো যে, তাদের আর বেশিদিন অপেক্ষা করতে হবে না, খুব শীঘ্রই তারা নাতী-নাতনী পাবে। নিথর আর নিতিয়ার আনন্দ যেন আর ধরে না। অনেক প্রস্তুতি নিতে লাগল নাতী নাতনীকে বরণ করার জন্যে।

নির্জনার কপালে সুখ যেন বেশিদিন স্থায়ী হলো না। সে বান্ধবী নিলিক্তাকে সুসংবাদটি জানানোর জন্য ফোন করল, নিলিক্তা দূরে থাকায় ফোনটি রিসিভ করতে পারেনি। নিলিক্তার স্বামী মিসকল দেখে নির্জনাকে কলব্যাক করে। নির্জনা তখন স্নানঘরে থাকায় নির্ণয় কল রিসিভ করে। নিলিক্তার স্বামীর কল পেয়ে, পুরুষ কণ্ঠ শুনে নির্ণয়ের মাথা গরম হয়ে গেল। এত বছরের ভালোবাসা যেন এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল, সে নির্জনাকে সন্দেহ করতে শুরু করল, নানা বাক্যবানে নির্জনাকে বিদ্ধ করতে লাগল। তার সন্দেহ এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, নির্জনার গর্ভের সন্তানকে নিয়েও সন্দেহ করতে লাগল। প্রতিদিন অশান্তি লেগেই থাকতো। নিথর আর নিতিয়া ছেলেকে অনেক বুঝানোর চেষ্টা করল; কিন্তু নির্ণয় কিছুতেই বুঝতে চাইল না। একদিন বাবা, মা, সন্তান সম্ভবা স্ত্রী ও সুখের সংসার ফেলে উধাও হয়ে গেল নির্ণয়। বাড়ীতে মৃত্যুশোক পড়ে রইল।

নির্জনা কি করবে, কি তার দোষ, কিছুই বুঝতে পারল না। সে বাবার বাড়ীতে চলে যেতে চাইলে শ্বশুর শ্বাশুড়ী বৌমাকে বলল, আমরা কি নিয়ে বেঁচে থাকবো, আমাদের বংশধর তোমার কাছে, তুমি আমাদের কাছেই থাক, তোমাকে দেখেই আমরা বেঁচে থাকতে চাই। চোখের পানি, নাকের পানি এক করে নির্জনা শ্বশুর বাড়ীতে রয়ে গেল, আর দিনের পর দির পথের দিকে তাকিয়ে থাকল নির্ণয় কবে ফিরে আসবে সে আশায়। বুকে একরাশ ব্যথা নিয়ে নির্জনা তাদের ভালোবাসার ফলকে এ পৃথিবীর আলো দেখালো। ছেলের নাম রাখল অরফান। কারণ বাবা থাকতেও তার সন্তান আজ এতিম। নির্জনা অরফানকে বাবা ও মায়ের ভালোবাসা একাই দিতে লাগল। অরফান মায়ের ও দাদা-ঠাকুরমার আদর যত্নে বড় হতে লাগল। অরফানের যখন তিন বছর তখন হঠাৎ তার ঠাকুরমা হার্টফেল করে মারা গেল। নির্ণয়ের কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তার বাবা এর দু'বছর পর পরপারে পাড়ি জমালো। বাবা মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেল না নির্ণয়। নির্জনা একা হয়ে গেল, সে একমাত্র সন্তান অরফানকে আকড়ে ধরে জীবন কাটাতে লাগল। নির্জনার বাবা মা আত্মীয় পরিজন অনেকবার তাকে বাবার বাড়ীতে নিয়ে যেতে চেয়েছে, কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। মাত্র ২৩ বছরের নির্জনা যেন দিনে দিনে আরো সুন্দরী হয়ে উঠল। অনেকেই তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, ছেলের দায়িত্ব নিতে চেয়েছে, কিন্তু নির্জনা কিছুতেই রাজী হলো না।

চারিদিক থেকে বিপদের আঁচ পেয়ে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে এক সময় অরফানকে নিয়ে নির্জনা কাউকে কিছু না বলে মাদার তেরেজার আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিল। পিছনে পড়ে রইল শ্বশুর শ্বাশুড়ীর অঢেল সম্পত্তি। অরফান অল্প

দিনের মধ্যেই আশ্রমের সবার সাথে মিশে গেল। আর নির্জনা ব্যস্ত রইল মাদার তেরেজার আশ্রমের পঙ্গু ও অসুস্থদের সেবায়। সিস্টারগণ অরফানকে স্কুলে ভর্তি করে দিল। অরফান বাবা ও মায়ের মতই মেধাবী। ক্লাশে প্রথম, খেলায়ও প্রথম। শিক্ষকদের আদর যত্নে বয়সে ও জ্ঞানে বড় হতে থাকে। অন্যদিকে নির্জনা নিঃশেষ হতে লাগল। আজো সে পথপানে তাকিয়ে থাকে তার ভালবাসার ব্যক্তিকে ফিরে পাওয়ার জন্যে। তার স্বাস্থ্য দিনদিন খারাপ হতে থাকে। সিস্টারগণ ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়ে একদিন আবিষ্কার করল নির্জনার ব্লাড ক্যানসার হয়েছে। চিকিৎসা শেষে নির্জনার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে।

নির্ণয়ের দীর্ঘ পনের বৎসর গোপনই রয়ে গেল। একদিন রাতে খাবার পর বাংলা চ্যানেলে একটি নাটক দেখছিল। নাটকটি যেন তার জীবনের সাথে মিলে গেল। সেখানে দেখানো হলো সন্দেহের কারণে দু'জনের মধ্যকার ভালোবাসা শেষ হয়ে গেল, স্বামী তার স্ত্রীকে সন্দেহ করল, যার কারণে পরিবারে বিচ্ছিন্নতা ডিভোর্স। ত্রিশ বছর পর প্রমাণ হলো স্ত্রী সম্পূর্ণ নির্দোষ। ততদিনে উভয়ের জীবন প্রায় শেষ, স্বামীটি বিয়ে করে নতুন সংসার করে জীবন কাটিয়েছে বটে; কিন্তু স্ত্রী বিয়ে না করে একাই বহু কষ্টে জীবন কাটিয়ে পরপারে চলে গেল। নাটকটি দেখে নির্ণয়ের চেতনা হলো, সে নিজের ভুল বুঝতে পারল, সে ফিরবে, নাটকের মত তাদের ভালোবাসার সমাপ্তি ঘটাবে না, নির্জনার কাছে ক্ষমা চেয়ে এক হবে, নতুন করে সব শুরু করবে। কিন্তু সেতো জানতোনা এ যে বড্ড বেশি দেরী হয়ে গেল। সে রাতেই ব্যাগ গুছিয়ে টিকিট কেটে রাখল পরদিন বাড়ী ফেরার জন্য। বাড়ী ফিরে এসে দেখতে পায় শূন্য বাড়ি হাহাকার করছে, কেউ নেই। নির্জনাকে খুঁজতে লাগল আত্মীয়দের মাঝে, বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু কোথাও খুঁজে পেল না। কারণ নির্জনা কারো কাছে নিজের ঠিকানা দেয়নি, কোন যোগাযোগও রাখেনি। মনের দুঃখে, বিবেকের তাড়নায় নির্ণয় পাগলপ্রায়, অন্যদিকে নির্জনা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। নির্জনাকে এবং তার না দেখা সন্তানকে খুঁজতে খুঁজতে, হাহাকার করতে করতে, অঢেল সম্পতির মালিক ও উচ্চ শিক্ষিত হয়েও আজ নির্ণয় আশ্রয়হীন হয়ে, দরিদ্র অবস্থায় না খেয়ে ঠিকানাবিহীন নির্ণয় অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তায় পড়ে রইল। সে আজ সন্দেহ করার করুণ পরিণতি ভোগ করছে। আত্মীয় পরিজন দেখেও না দেখার ভান করছে, তার যত্ন করার দায়িত্ব নিচ্ছে না। যুবকেরা রাস্তায় পড়ে থাকা নির্জনকে দেখে স্থানীয় ফাদারকে সংবাদ দিল। ফাদার তাকে নিয়ে মাদার তেরেজার আশ্রমে চিকিৎসার জন্যে পাঠালেন। নির্জনা ও নির্ণয় একই আশ্রমে দু'জন দু'কক্ষে। মাদার তেরেজার সিস্টারদের ও সেবাকর্মীদের কাছ থেকে চিকিৎসা ও সেবাযত্ন পেয়ে নির্ণয় কিছুটা সুস্থ হলো। লাঠি নিয়ে কিছুটা হাঁটতে পারে। একদিন হাঁটতে হাঁটতে মহিলা ওয়ার্ডের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় কান্নার শব্দ শুনতে পেল। নির্জনা যন্ত্রনায় ছটফট করছে আর অসহ্য যন্ত্রণায় কাঁদছে। নির্ণয় ভিতরে প্রবেশ করে নির্জনাকে দেখে হতবাক, তাড়াতাড়ি নির্জনাকে নিজের কোলে নিল। নির্জনা একপলক তাকিয়ে থেকে একটি মুচকি হাসি দিয়ে পরপাড়ে পাড়ি জমালো। তার ছেলে অরফান সত্যিকারের এতিম হয়ে গেল।

অরফান মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দৌড়ে এল, অনেকক্ষণ কাঁদলো, কারণ পৃথিবীতে তার আপন বলতে কেউ রইল না। বাবাকে দেখে চিনতে পারল না, কারণ বাবাকে সে কোনদিন দেখেনি তার জন্মাবার আগেই বাবা উধাও হয়ে গিয়েছিল। সিস্টারগণ যখন বললেন, এ তোমার বাবা অরফান তখন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। সে এখন ১৮ বছরের টগবগে যুবক। কলেজে পড়াশোনার পাশাপাশি আশ্রমের রোগীদের সেবাযত্ন করে। প্রতিটি কক্ষে সে যায়, কিন্তু যে কক্ষে তার বাবা আছেন সেটি এড়িয়ে যায়। সিস্টারগণ অরফানকে অনেক বুঝায়, কিন্তু অরফানের হৃদয় গভীরে যে ক্ষত রয়েছে তা কি এত সহজে শুকাবে? মায়ের কাছে বারে বারে জানতে চেয়েও বাবার সম্বন্ধে তেমন কিছুই জানতে পারেনি। প্রথমে তার মা বলতো, তোর বাবা বিদেশে আছে। কিন্তু কতদিন আর ছেলেকে মিথ্যা সান্ত্বনা দেবে? তাই শেষের দিকে বলে দিলো, তোর বাবার কোন খবর আমি জানি না। আর তখন থেকেই বাবার প্রতি ঘৃণা ও তিক্ততা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেনি অরফান।

দিনটি ছিল পুণ্য শুক্রবার। ক্রুশের পথ করতে ছিল অরফান। দ্বাদশ স্থানে দেখতে পেল যিশুর হাত ও পা বেয়ে রক্ত পড়ছে, মাথার কাঁটার মুকুট থেকে রক্ত পড়ছে, আর যিশু অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করছেন। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝড়ে যখন সব রক্ত নিঃশেষ হলো তখন তিনি প্রাণত্যাগ করলেন। যিশু তাঁর শেষ রক্তবিন্দু বিলিয়ে দিলেন। ক্রুশের উপর যিশুর এ কষ্ট ধ্যান করার সময় এক দৈব বাণী শুনতে পেল "তোমার বাবার কাছে যাও, তার সাথে মিলন করে আবার আমার কাছে এসো।" অরফান আর দেরী না করে বাবার কাছে গেল, তাকে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ দু'জন কাঁদলো। পিতাপুত্রের এ কান্নার সাথে অরফানের সমস্ত ক্ষোভ, রাগ, অভিমান শেষ হয়ে গেল। উভয়ের বুক থেকে যেন একটা বড় পাথর সরে গেল। তাদের হৃদয়মন পুনরুত্থানের আনন্দে ভরে উঠলো। সিস্টারগণ এ দৃশ্য দেখে আনন্দ মেতে উঠলেন। কারণ এ আশ্রমে সত্যিকারের পুনরুত্থান হলো॥ ❑

লেখক: অধ্যক্ষ
সেন্ট মেরীস স্কুল এণ্ড কলেজ

পুনরুত্থিত যিশু

মালা চিরান

এই নশ্বর পৃথিবীতে যিশু মহান
দয়ার সাগর
ও অসীম প্রেম ও ভালোবাসা।
যিশু এতো পাপী মানুষকে
ভালোবেসেছিল,
সেতো কোন জনমানবের সাথে
তুলনা হয় না।
আমরা পাপী মানুষ পাপকরে দূর দেশে
চলে যাই অপব্যয়ী পুত্রের মত
তবু যিশু আমাদের অসীম
ভালোবাসেন।
হ্যাঁ যিশু লাসারের মৃত্যুতে বলেছিল,
যে আমার প্রতি
বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত হবে।
যিশু নিজেই বলেছিল, আমি পুনরুত্থিত
যিশু নিজের জীবন দিয়ে
পাপী মানবজাতিকে ভালোবেসে স্বপ্নের
দ্বার খুলে দিলেন।
হ্যাঁ, তাইতো মানবজাতি
পুনরুত্থিত যিশুর
জয়ধ্বনি করছে যুগ-যুগান্তরে।
বনের পাখি গানে গানে মুখরিত আজি
পাহাড়ী ঝর্ণা, পর্বতমালা, নদ-নদী সাগর
সবই আজ উল্লসিত!
হ্যাঁ, তাইতো যিশু শুভ্র প্রদীপ
মহান শান্তিময়
ওম শান্তি ওম শান্তি॥

মুক্তিযুদ্ধের শত স্মৃতি শত কথা-২

সুনীল পেরেরা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

অগ্যতা সেদিনের মত অপারেশন স্থগিদ রেখে আমরা চলে এলাম পুইনারটেক। পরদিনও রেকি করে দেখা গেল আর্মিরা মেশিনগান ছেড়ে নামেই না। অগত্যা মুক্তিযোদ্ধা দলটি চলে যায় ঢাকার দিকে। হাসু ভাই ডাঙ্গাতেই রয়ে যায়। পরে হয়তো তার সাথে দলের মিলন হয়েছে। বাদ্যকর পাড়ার এই হাসু ভাইয়ের সাথে আমার হৃদ্যতা হয়েছিল ' আলোমতি ও প্রেমকুমার' যাত্রা করতে গিয়ে। আমি প্রেমকুমার আর হাসু জংলী রাজা। সেই থেকে শুরু পরবর্তীতে যুদ্ধ শেষে সে বিডি আর এ যোগ দেয় এবং শেষ জীবনে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যও বানিয়ে ছিলাম তাকে।

কিছুদিন পর ঢাকা থেকে বাড়ি এসে শুনলাম কিরন, গিলবার্ট, হেনরী, সুশান্ত, বিজয় সহ ৮-১০ জন ভারতে চলে গেছে ট্রেনিং নিতে। পরের সপ্তায় এসে শুনলাম আমাদের বাড়ির বাদলও গেছে। খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম এখন আর ওপারে যাওয়ার মত কেউ নেই। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমার আর যুদ্ধে যাওয়া হলো না। বন্ধুরা অনেকেই বৌ রেখে যেতে রাজি নয়। আমি তখন অবিবাহিত। প্রতি সপ্তাহে বাড়ি আসি অর্ধেক বাসে, বাকীটা পায়ে হেঁটে। হয় টঙ্গি না হয় ক্যান্টনমেন্ট গিয়ে বাসে উঠতে হয়। ট্রেনে নিরাপদ নয়। স্টেশনে আর্মিরা থাকে, নজরে পড়লে রক্ষা নাই। আবার এখানে সেখানে মুক্তিযোদ্ধারা ট্রেন ফেলে দিচ্ছে বোম মেরে। ভোর চারটায় বাড়ি থেকে বের হতাম তিন চার জন মিলে। শহরে যেতে যেতে ভোর পেরিয়ে সকাল হয়ে যেত। একবার ফ্রান্সিস গমেজ, নিকোলাস গমেজ ও আমি খুব ভোরে রওনা দিলাম। পথে নামতেই মুষলধারে বৃষ্টি। পাওরান গিয়ে দেখি বিলের পানিতে রাস্তা ডুবে একাকার। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে, আকাশে বিদ্যুতের খেলা। অগত্যা নেমে পড়লাম পানিতে। গলা পর্যন্ত পানি। প্রচন্ড স্রোত। অন্ধকারে আমি আর নিকু ভাই ওপারে চলে গেলাম। পেছনে দেখি ফ্রান্সিসদা নেই। স্রোতের টানে ব্যাগ আর ছাতা বাঁচাতে গিয়ে সে বিলের মাঝখানে চলে গেছে। খেতের আলে দাঁড়িয়ে সে ক্ষীণ কণ্ঠে আমাদের ডাকছে। এই জায়গাটার বেশ বদনাম শুনেছি এর আগে। অনেকে ভয় পেয়েছে বলেও নৌকার মাঝি জানিয়েছে। বর্ষায় এখানে নৌকায় পারাপার হয়। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সিসদাকে অনেক কষ্টে উদ্ধার করে ভেজা কাপড়ে ঢাকা পৌঁছালাম।

বর্ষা এলেও আমাদের বাড়ি আসা-যাওয়া বন্ধ হয়নি। নৌকা ভারা করে গুলশান থেকে ওঠতাম আবার এখানেই সকালে এসে নামতাম। নৌকায় বরোয়ার বিলে আসলে মনে হতো স্বাধীন বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছি।

আমার সহকর্মী আনোয়ার হোসেন ছিল বিক্রমপুরের লোক মুন্সিগঞ্জের হাসারা গ্রামে বাড়ি। তার ছোট ভাই আহসান ছাত্র নেতা। ন্যাপের ডেডিকেটেড ছাত্র নেতা সবে মাত্র ভারত থেকে ট্রেনিং শেষে ঢাকা শহরে এসেছে। দুই তিনটা অপারেশন শেষ করে আবার ভারতে চলে যাবে। একদিন তার সাথে দেখা কথায় কথায় আলাপ হলো শেষে চূড়ান্ত হলো তার সাথে আমাকে ভারতে নিয়ে যাবে। জানি মাকে বললে যেতে দেবে না। তাই নিকু ভাইয়ের কাছে খবরটা দিয়ে ব্যাগে সামান্য কাপড় নিয়ে অফিসে চলে এলাম। অফিসে একমাত্র সহকর্মী আনোয়ার ভাই ছাড়া আর কাউকে কিছু বলি নি। আহসান ভাই দুপুরে আসার কথা। এখানে লাঞ্চ করে দু'জন চলে যাবো। সারাদিন তার দিকে পথ চেয়ে অপেক্ষা করলাম তিনি এলেন না। রাত দশটায় নিরাশ হয়ে মেসে ফিরে এলাম মহাখালী হাজারীর বাড়িতে। এভাবে তিন দিন প্রস্তুতি নিয়ে অফিসে গেলাম। না, আহসান ভাই এলেন না। শেষে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম যে, তিনি হয়তো জরুরী কাজে একাই চলে গেছেন।

সপ্তাখানেক পরে হটাৎ এক দীর্ঘদেহী ঢাকাইয়া যুবক এসে আমাকে আর আনোয়ার ভাইকে খুঁজতে থাকে। তার কাছে থেকে সংবাদ শুনে চোখে জল এসে গেল। সে জানালো, আহসান ভাই বোমা বানাবার সরমঞ্জামসহ ধরা পড়েছেন। আর্মিরা তাকে ক্যান্টনমেন্ট চালান করে দিয়েছে। বোমার মালামাল নিয়ে দয়াগঞ্জ থেকে সূত্রাপুর লোহারপুল দিয়ে আসার পথে রাজাকারের দল তাকে চ্যালেঞ্জ করে। ভয়ে প্রাণ বাঁচাতে দৌঁড়ে একটা হোটেলে ঢুকে পড়ে। সেখানে থেকেই রাজাকারের দল তাকে গ্রেফতার করে। মূলত একটি মেয়ে এই ব্যাগটি বহন করার কথা ছিল। কোন কারণে মেয়েটি না আসতে আহসান নিজেই ওটা নিয়ে রওনা দিয়েছিলো। ছেলেটির বাবা হোটলের ব্যবসা করে। তাই মোটা অংকের ঘুষ দিয়ে শান্তিবাহিনীর নেতা ধরে ছাড়া পেয়েছে। আহসান ধরা পরার রাতেই তার সহকর্মী তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সে জানালো, আহসান ভাইয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে রোল দিয়ে পিটিয়ে শরীর ফাটিয়ে ফেলেছে। মোটা অংকের টাকা ছাড়া তাকে ছাড়ানো যাবেনা। এরপর আর মুক্তিযুদ্ধে যাবার কোন সুযোগই পেলাম না। দেশ স্বাধীন হবার পর ক্যান্টনমেন্ট ক্যাম্প থেকে ইন্ডিয়ান আর্মিরা আহসানকে উদ্ধার প্রায় মৃত অবস্থায়। সারা দেহে পচন ধরেছে। পরে সরকার তাকে রাশিয়ায় পাঠিয়ে সুস্থ করে আনে। রাতদিন বিরামহীন গুলির শব্দ। মাঝে মাঝে শেল এসে পড়ে গ্রামে। তাই বাড়ির পশ্চিমে আর দক্ষিণে বাংকার বানিয়েছি। বাড়ি এলেই রাত জেগে অন্যদের সাথে পাহাড়া দেই। বাড়ির ঘাটে বড় ক্রুশ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। লোক মুখে শুনেছি ইসাই অর্থাৎ খ্রিস্টানদের ওপর হামলা করে না। কারণ আমেরিকা সরকার পাকিস্তানের প্রধান গুরু। তাই প্রত্যেকের গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে রেখেছি। অখ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের অকাতরে খুলে দিয়েছি গলার রূপোর চেইন।

একদিন খবর রটে গেল গ্রামে আর্মিরা হামলা করবে। যেই শোনা অমনি হিন্দুরা দলে দলে খ্রিস্টান পাড়ায় চলে আসতে থাকে। জলে ডোবা গ্রাম তাই ওরা ভেবেছে আমাদের পাড়াটা নিরাপদ। পথের ধারে শৈলেনদের বাড়ি। দুপুরবেলা দেখি শীল পাড়ার পচা নাপিত পরিবার পরিজন নিয়ে এসে হাজির। তাকে বুঝালাম অনেক কিন্তু সে এই বাড়ি ছাড়া অন্যত্র যাবে না। শৈলেনের বাবা তার মিতা এবং বিশ্বাস ভাজন ব্যক্তি। অনেক বুঝিয়ে তাকে অন্যত্র সরিয়ে দিলাম গ্রামের ভিতরে। সে রাতে কোন হামলা হলোনা। লোকটার জন্য মনে কষ্ট পেলাম তাড়িয়ে দেবার জন্য।

হঠাৎ করেই পূবাইলের ওপাশে বেলাই বিলের ধারে বাড়িয়া গ্রামে আক্রমন চালায়। দুপুর বেলা সবাই ক্ষেতে-খামারে কাজে ব্যস্ত, বৌ-ঝিরা রান্না বসিয়েছে অমনি গুলি, অগ্নি সংযোগ আর লুটপাট। হিন্দু বাড়ি গুলি সব পুড়ে ছাই। ৫৪ জন নিরিহ মানুষ মারা গেল। যারা প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছে তারা হয় রাঙ্গামাটিয়া না হয় নাগরীতে আশ্রয় নিয়েছে। অকতোভয় ফাদার গেডার্ট অসহায় এই সব মানুষগুলোকে আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য ও চিকিৎসা সেবাও দিয়েছেন। এদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। প্রায় তিন মাস এই শরণার্থী ক্যাম্প খোলা ছিল। নাগরীর অনেক বাড়িতেও তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়। আর্চবিশপ গাঙ্গুলীর নির্দেশে প্রতিটি খ্রিস্টান বাড়ি এক একটি আশ্রয়কেন্দ্র হয়ে ওঠেছিল।

(চলবে)

স্বাস্থ্যকথা

কর্মীর মানসিক চাপ ও তা মোকাবেলার উপায়

চয়ন এইচ রিবেরু

আমরা শুধুই প্রতিনিয়ত পেতে চাই, এ পাওয়ার ইচ্ছাই আমাদের দিন দিন স্বার্থপর করে তুলছে। আর ব্যক্তি স্বার্থপরতা আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তাই আমরা লক্ষ করছি যে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানুষ স্বার্থপরতায় লিপ্ত হয়ে বহু অকল্যাণকর ও মানবতা বিরোধী নানাবিধ কর্মতৎপরতায় সক্রিয় রয়েছে। গোষ্ঠিতে গোষ্ঠিতে, জাতিতে, জাতিতে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে আজ স্বার্থের প্রতিযোগিতা চলছে। মানুষ মানুষের জন্য সহযোগিতার হাত না বাড়িয়ে বরং প্রতিযোগিতা ও অসহনশীলতায় মেতে উঠেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। পাশাপাশি ডিজিটাল ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লব যুগে মানুষের মধ্যে পাওয়ার ইচ্ছা, স্বার্থপরতার ও বস্তুবাদীতার কারণে বর্তমান জগতে বহুমাত্রিক জটিলতার দেখা দিচ্ছে। মানুষের মধ্যে নানা ধরণের মানসিক চাপ সৃষ্টি হচ্ছে যা মানুষের স্বাস্থ্য, আচার অচরণে প্রভাব ফেলছে। আবার এর ফলে মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যভাবে বলতে গেলে মানুষের সৃজনশীলতা/কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা কমছে। মানসিক চাপ তখনই হয় যখন একজন মানুষ তার বিভিন্ন কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়। কাজ সংক্রান্ত মানসিক চাপ বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন: কাজ করার ক্ষমতার চেয়ে যদি কর্মীর কাজ বেশি থাকে, সহকর্মী/ বসের সাথে সমস্যা সৃষ্টি, কাজের ধরণ দ্রুত পরিবর্তন, চাকুরীর অনিশ্চয়তা ইত্যাদি। যদি আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি কোন্ কোন্ বিষয়গুলো আমাদের মানসিক চাপ সৃষ্টি করে? উত্তরে বলা যায়: ছেলেমেয়েদের স্কুল সংক্রান্ত, পরিবার, বিভিন্ন আত্মিক ও সামাজিক সম্পর্কের টানাপোড়ন, আইনগত, আর্থিক, অসুস্থতা, পরিবেশ এবং জীবন যাপন ইত্যাদি। আবার আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি চাকুরীর ক্ষেত্রে কি কি কারণে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়? উত্তরে বলা যায়: চাকুরী সংক্রান্ত জটিলতা, চাকুরীর অনিশ্চয়তা, কর্মীর কাজ থেকে অতিরিক্ত প্রত্যাশা, কর্মী বান্ধব উর্দ্ধতন না থাকা, কর্মক্ষেত্রের সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক এবং প্রযুক্তি ইত্যাদি।

মনোচিকিৎসকের মতে, মানুষ যখন তার মানসিক চাপ আর সহ্য করতে পারে না, তখনই সে মানসিক ও শারীরিক রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ে এবং তার আচার আচরণে প্রকাশ পায়। শারীরিক বা মানসিক, অভ্যন্তরীন বা বহিস্থ, উচ্ছ্বাসমূলক বা উত্তেজক পদার্থের প্রতি শারীরিক সাড়ার সামগ্রিকতাকে স্ট্রেস বলে। আর যে ঘটনার জন্য এ স্ট্রেস তৈরী হয় তাকে Stressor বলে।

যে কোন অবস্থা/চিন্তা থেকে কর্মী উদ্বিগ্নতা, ক্রোধ, নিরাশা ও বিষন্নতা অনুভব করলে তাকে মানসিক চাপ/কর্মী পীড়ন বলে। তাই মানসিক চাপ হচ্ছে শারীরিক, মানসিক/ আবেগের সমন্বয়ে পরিবর্তিত এক দৈহিক প্রতিক্রিয়া।

বিখ্যাত কয়েক জন মানসিক চাপ বিষয়ক বিশাদের সজ্ঞা থেকে তা সহজে অনুমান করা যাবে আসলে মানসিক চাপ বলতে উনারা কি বুঝাতে চেয়েছেন:

Hans Selye (one of the founding father of stress research): "Stress is not necessarily something bad – it is all depends on how you take it. The stress of exhilarating, creative successful work is beneficial, while that of failure, humiliation or infection is detrimental".

Richard and Lazarus: Stress is a condition or feeling experienced when a person perceives that demand exceed the personal and social resources the individual is able to mobilize".

Decenzo and Robins:" stress is a dynamic condition in which an individual confronts an opportunity, constraint, or demand related to what he or she desires, and for which the outcome is perceived as both uncertain and important."

উপরোক্ত বিশাদের সংজ্ঞাগুলো বিশেষণ করলে দেখা যায় যে, পরিবর্তীত পরিস্থিতির মধ্যে কর্মীদের মধ্যে যে রাগ, নিরাশা ও দুঃখ বা হতাশা দেখা যায় তাকেই মানসিক চাপ বলে।

স্ট্রেস কিভাবে তৈরী হয়: স্নায়ুতন্ত্র এবং কিছু নির্দিষ্ট হরমোনের মাধ্যমে আমাদের শরীর স্ট্রেসরের প্রতি সাড়া দেয়। মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস। পিটুইটারি গ্রন্থির মাধ্যমে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিকে বেশী পরিমাণে অ্যাড্রেনালিন ও কর্টিসোল হরমোন তৈরী করার জন্য এবং তা রক্তে অবমুক্ত করার জন্য সংকেত পাঠায়। এ হরমোন হার্টের মাধ্যমে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে স্ট্রেস তৈরী করে।

মানুষের চাপের/পীড়নের ধরণ: পীড়ন দু'ধরনের হতে পারে। ইতিবাচক এবং নেতিবাচক। কিছু মানসিক চাপ আছে যা মানুষের সৃজনশীলতায় বা কাজ করার জন্য অনুপ্রাণিত করে, সেগুলো হল ইতিবাচক মানসিক চাপ: যেমন বিয়ের পূর্বে মানসিক চাপ। আবার কিছু মানসিক চাপ আছে যা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক এমনকি জীবকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলে, সে চাপ গুলো হল নেতিবাচক চাপ: যেমন: ছেলে মেয়ে ভাল স্কুলে / কলেজে সুযোগ পাচ্ছে না/ পড়াশোনা করতে চায় না।

অনুকূল মানসিক চাপ: ইংরেজিতে Eustress বলে। এটা গ্রিক শব্দ Eu (ইউ) এর অর্থ Well or good যার বাংলা আভিধানিক অর্থ হলো ভালো/সুস্থ/ অনুকূল ইত্যাদি। অনুকূল মানসিক চাপ /পীড়ন একজন কর্মীকে তার পেশী, হৃদয় ও মনে সেই শক্তি বা অনুপ্রেরণা এনে দেয়, যা তার ঐ কাজ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সহায়তা করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যেমন: ছেলেমেয়ে ভাল স্কুলে/ কলেজে ভর্তি হতে পেরেছে বা হঠাৎ বড় অংকের টাকার লটারী পাওয়া ইত্যাদি মানুষকে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে যা তাকে কাজ করার অনুপ্রেরণা যোগায়।

কর্মবিপাক (Distress): এটা এক ধরনের নেতিবাচক মানসিক চাপ যা একজন মানুষকে তার কাজ করার থেকে বিরত রাখতে সহায়তা করে। যখন মানুষের উপর নিয়মিত ও অতিরিক্ত কাজের ভার দেয়া হয়, তখন মানুষের উপর এক ধরনের চাপ সৃষ্টি হয়, যার বর্হিপ্রকাশ ঘটে তার বিভিন্ন অচার -আচরণের মধ্যদিয়ে। সোজা কথায় মানুষ তা মেনে নিতে পারে না এবং এর সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারে না। এটা আবার দু' ধরনের হতে পারে:

K) **উপসময়োগ্য মাসনিক চাপ**(Acute Stress): মানুষের নিয়মিত কাজ ছাড়াও হঠাৎ কোন পরিবর্তন মানুষের মনে চাপ সৃষ্টি হতে পারে যা অল্প সময়ের মধ্যে সামলিয়ে নিতে পারে। এ ধরনের চাপ মানুষের আবেগ থেকে সাধারণত হয়ে থাকে এবং তা দ্রুতই সেরে যায়। যেমন: খুবই ঘনিষ্ঠ কোন সহকর্মীকে অন্য অফিস বা শাখায় স্থানান্তরিত করা হল। এতে সহকর্মীর কয়েকদিন মন খারাপ লাগবে, তারপর আস্তে আস্তে ঠিকই মানিয়ে নেয়।

L) **ক্রমিক মাসনিক চাপ** (Chronic Stress): যে সকল মানুষ ঘন ঘন কাজ পরিবর্তন করে বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঘন ঘন

কাজ পরিবর্তন করা হয়, তখন মানুষের মধ্যে যে মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়, তখন তাকে ক্রসিক মানসিক চাপ বলা হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হয়।

মানসিক চাপ/ পীড়ন -এর উপাদান: একজন মানুষ তার উদ্বিগ্নতা, রাগ, নিরাশা, হতাশা ও বিষন্নতা মনে করলে তখন তাকে মানসিক পীড়ন (Stress) বলে। আবার এগুলো হওয়ার জন্য যে উপাদান নিয়ে চাপ গঠিত হয়, তাদেরকে Stressors বলে। সকল কারণকে উপাদান বলা যেতে পারে, আবার সকল উপাদানকে কারণ হিসাবে গণ্য করা যাবে না। যে উপাদানগুলো একজন মানুষে মানসিক চাপের সৃষ্টি করে সেগুলো হ'ল: সাংগঠনিক সংস্কৃতি, অব্যবস্থাপনা, চাকুরির চাহিদা ও বিয়ষবস্তু, ভৌত অবকাঠামো ,কর্মক্ষেত্রে সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন, অসহযোগিতা, ভূমিকার দ্বন্দ্ব, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আরচণ, মানসিক বিপর্যয়/অপ্রীতিকর ঘটনা ইত্যাদি।

তাছাড়া সামগ্রিকভাবে সম্ভাব্য প্রধান তিন ধরনের মানসিক চাপের উৎস ও তার ফলাফলের চিত্র নিম্নে দেখানো হল:

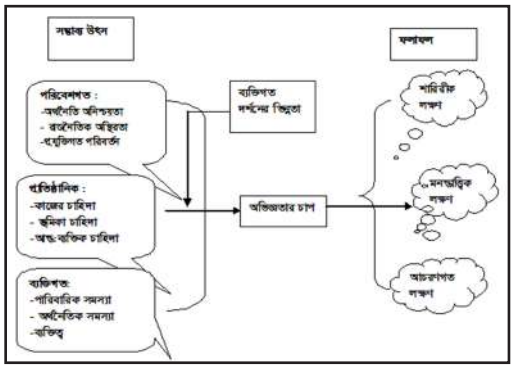

মানসিক চাপ/ কর্মীর পীড়ন -এর কারণ: বিভিন্ন কারণে একজন মানুষ মানসিক চাপ অনুভব করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বা পারিবারিক কারণে মানসিক চাপ হলে তা সাধারণত দীর্ঘ স্থায়ী হয়। দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপের কারণে মানুষের স্বাস্থ্যগত সমস্যা হতে পারে। কার্যক্ষেত্রে মানসিক চাপের কারণগুলো হল:

K) **কাজের দীর্ঘ সময়:** অনেক প্রতিষ্ঠানে দেখা যায়, কর্মীর যে সময় পর্যন্ত কাজ করার কথা, সে সময় কাজ শেষ করতে পারে না বা উর্দ্ধতনগণ কর্মঘন্টা ইচ্ছামত বাড়িয়ে দেয়, তখন কর্মীদের মধ্যে এক ধরনের একঘেয়েমীতে ভোগে এবং তারা চিন্তায় থাকে কখন কাজ শেষ হবে। এর ফলে কর্মীরা মনে এক ধরনের চাপ অনুভব করে।

L) **কার্যভার:** আমরা প্রায়ই শুনি যে কর্মী কাজের ভারে হতাশায় ভুগছে। অর্থাৎ কর্মীর একটি কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই অন্য আর একটি কাজ ধরিয়ে দেয়া হলে, তখন কর্মীর ভিতরে পূর্বের কাজ বাদ দিয়ে নতুন কাজের জন্য মানসিক চাপে পড়ে যায়।

M) **কর্মাবর্তন:** উর্দ্ধতন যখন একজন কর্মীকে একটি পর আর একটি কাজ দিতে থাকে তখন ঐ কর্মী মানসিক চাপে পড়ে।

N) **ডেড লাইন:** যে কোন প্রতিষ্ঠানের কাজ কর্মগুলো যদি পরিকল্পনা অনুযায়ী সঠিক সময়ের মধ্যে করতে পারে, তা হলে, সে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়। আর প্রতিটি প্রতিষ্ঠান চায়, তার কাজগুলো নির্ধারিত সময়ে মধ্যে সম্পন্ন হউক। এ নির্ধারিত সময়ে মধ্যে কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তিগণ নিয়মিত কর্মীর উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকলে কর্মীরা মানসিক চাপে পড়ে।

O) **চাকুরীর অনিশ্চয়তা:** বর্তমান প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, প্রতিটি কর্মী তাদের চাকুরী নিয়ে চিন্তিত। বিশেষ করে এনজিও সেক্টরে দাতাদের তহবিলের উপর নির্ভরশীল। যদি দাতাদের তহবিল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে কর্মীরা মনে করে চাকুরী চলে গেলে আবার চাকুরী পাবে কিনা বা পেলেও তা দিয়ে পরিবারের চাহিদা মিটাতে পারবে কিনা ইত্যাদি বিষয়ে তারা মানসিক চাপে পড়ে। শুধু এনজিও সেক্টরেই নয় বর্তমান সাড়া বিশ্ব এক ক্রান্তি লগ্ন পার করছে এবং তার প্রভাব প্রতিটি করপোরেট সেক্টরেও পড়েছে।

P) **বিরক্তিকর কাজ:** প্রতিষ্ঠানের সকল কাজ সমান নয় বা কর্মীদের কাছে আকর্ষণীয় নয়। যদি কর্মীর কাজের প্রতি ভালোবাসা বা দরদ কমে যায়, সে ক্ষেত্রে কর্মীরা বিরক্তবোধ নিয়ে কাজ করে, শুধু কাজ করার জন্য কাজ করে।

Q) **অপ্রতুল কার্যদক্ষতা:** আমাদের দেশের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, বেশিরভাগ মানুষ যে বিষয়ে পড়াশোনা করেছে, সে অনুযায়ী কাজ পাচ্ছে না। আবার মামা চাচার জোড়ে কাজ পাচ্ছে। এতে করে, যে কাজে কর্মী যোগদান করল সে কাজে তার দক্ষতা প্রথ্যাশিত মাত্রায় থাকে না । সংশ্লিষ্ট কাজে কর্মীর দক্ষতা না থাকলে, কর্মীর মনে এক ধরণের মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়। আর এ মানসিক চাপ যদি দীর্ঘ দিন স্থায়ী হয়, তবে কর্মীর স্বাস্থ্য ও মানসিক বৈকল্যের সৃষ্টি হয়।

R) **অতিরিক্ত তত্ত্বাবধান:** প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ব্যবস্থাপকীয় কাজ সম্পাদন করতে হয়। আর এ কাজ করতে গিয়ে যদি মাত্রারিক্ত তত্ত্বাবধায়ন করে। সেক্ষেত্রে কর্মী তার স্বাভাবিক কাজ করতে পারে না এবং সব সময় কর্মীরা মানসিক চাপে থাকে, কখন বস কি বলল। ফলে কর্মীর উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। যেমন: আমাদের দেশের গার্মেন্টসগুলো বাড়াবাড়ি পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ন করে।

S) **অপ্রতুল উপকরণ:** কর্মী যে কাজ করে সে কাজের জন্য যে সকল উপকরণ প্রয়োজন, সে ধরনে উপকরণ বা কর্ম পরিবেশ না পায় তা হলে কর্মীরা মানসিক চাপে পড়ে।

T) **সহকর্মী/বসের সাথে সম্পর্ক:** একজন মানুষ তার বেশিরভাগ সময় ব্যয় করে তার কর্মক্ষেত্রে। তাই তার কর্মক্ষেত্রের সহকর্মী বা বসের সাথে সম্পর্কের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। যদি সহকর্মীদের সাথে সর্ম্পক ভালো থাকে, তা হলে কাজের স্পৃহা বেড়ে যায়। আর যদি তার উল্টোটি ঘটে, তাহলে কোন কিছুই ভালোভাবে চলে না। কারণ এগুলো প্রতিটি মানুষের মনের উপর প্রভাব ফেলে। আর মনই আমাদের দেহকে কাজ করার প্রবৃত্তি তৈরী করে।

মানসিক চাপ/কর্মী পীড়ন লক্ষণ

কর্মক্ষেত্রে সাধারণত তিন ধরনের মানসিক চাপের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়:

শারীরিক: কর্মক্ষেত্রের মানসিক চাপের জন্য একজন কর্মীর ভিতরে ও বাহিরে নানা ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। যার প্রভাব কর্মীর ব্যক্তি জীবন ও কর্মক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয় এবং যে লক্ষণগুলো দেখা যায়, সে গুলো হল: শারীরিক শ্রান্তি,

পেশিতে খিচুনি, হার্টবিট বৃদ্ধি, মাথা ব্যাথা,অনিদ্রা, হৃদরোগ, ডায়াবেটিবস এবং উচ্চ রক্তচাপজনিত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

মনস্তাত্বিক: একটি প্রচলিত কিংবদন্তী আছে যে, মন ঠিক তো সব ঠিক। আর কর্মীদের মানসিক চাপটি প্রথমেই আঘাত হানে কর্মীর মনে আর যদি মন ভেঙ্গে যায় তাহলে কর্মী কাজ থেকে তার মনকে সরিয়ে নেয়। এর ফলে যে প্রভাব গুলো পরিলক্ষিত হয়, সেগুলো হল: উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি, কাজের প্রতি উদ্যোমহীনতা, হঠাৎ করে উত্তেজিত হওয়ার প্রবণতা,হাতাশা প্রকাশ করা, অসহিষ্ণুতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি।

আচরণগত: মানসিক চাপের কারণে এক জন কর্মীর আচার আচরণের উপর প্রভাব পড়ে এবং তার ফলে কাজের গতিশীলতা বা উৎপাদনশীলতা কমে যায়। এছাড়া যে প্রভাবগুলি দেখা যায় সেগুলো হ'ল: কাজে প্রায়ই অনুপস্থিতি থাকা এবং তা দিনদিন বৃদ্ধি পায়, আক্রমানাত্মক মনোভাব, সৃষ্টিশীলতা হ্রাস, আন্তঃসম্পর্কে'র অবনতি ঘটে, খাদ্যাভাসে পরিবর্তন, অস্থিরতা এবং ধূমপান বা মাদক গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া।

মানসিক চাপ/কর্মী পীড়ন কমানোর উপায়

মানসিক চাপের কারণে কর্মীর কর্ম ক্ষমতা,

স্বাস্থ্যের অবনতি ও ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রভাব ফেলে, তখন মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেয়া অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। তাই মানসিক চাপের মাত্রা এবং এ চাপ কমানোর কিছু উপায় আলোচনা করা হল:

মানসিক চাপের লক্ষণগুলো চিহ্নিত করা: কর্মী কর্মভারে বা কর্ম চাপে বা পরিবেশের কারণে প্রথমত মানসিক ভাবে ভেঙ্গেপড়ে এবং বিভিন্ন লক্ষণ তখন পরিলক্ষিত হয়। এ লক্ষণগুলো কি কি তা প্রথমে চিহ্নিত করা অতি জরুরী এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নিজের প্রতি যত্নবান হওয়া: এর অর্থ এ নয় যে আমার পুরো জীবনটাই পাল্টিয়ে ফেলা। ছোট ছোট অভ্যাস পরিবর্তন করে, বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিজেকে সংশ্লিষ্ট করে, আমরা আমাদের মানসিক চাপ কমিয়ে কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারি। যেমন: প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় বের করে ব্যায়াম করা, খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করে এবং সামাজিক কোন স্বেচ্ছা সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে কাজ করে - একজন কর্মী মানসিক চাপ কমাতে পারে এবং কাজের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে।

সময় ব্যবস্থাপনা: সময় এমন একটি সম্পদ যা ধরে বা জমিয়ে রাখা যায় না। তাই এর সুষ্ঠু ব্যহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের মানসিক চাপ কমাতে পারি এবং নিজেদের অবসর সময়কে উপভোগ করতে পারি। এর জন্য প্রয়োজন একটি কর্মতালিকা প্রস্তুত করা এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ করা। পাশাপাশি অতিরিক্ত কাজের চাপ না নেয়া, সময় মত অফিসে আসা এবং সময় মত অফিস ত্যাগ করা ইত্যাদি।

অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ: একজন কর্মী তার আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে যদি তার অনুভূতিগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তা হলে সে যে কোন গঠনমূলক বা ইতিবাচক কাজে নিজেকে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন আত্মসচেতনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সচেতনতা এবং সম্পর্ক উন্নয়ন করার চেষ্টা করা।

বদ অভ্যাস ত্যাগ করা : কিছু লোক আছে তারা মনে করে সব কিছু সঠিক হতে হবে। সব কিছু নিখুঁত হতে হবে এমন অবাস্তব চিন্তা না করাই ভাল। তাই একেবারে বিশুদ্ধবাদী না হয়ে, সময়মত কাজ সম্পাদন, বদ অভ্যাস এবং নেতিবাচক চিন্তাগুলো ত্যাগ করতে পারলে মানসিকচাপ অনেক কমে যায়।

সাংগঠনিক উপায়: মানসিক চাপ প্রশমনের জন্য ব্যবস্থাপক কর্মীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তা নিরসন করতে পারেন। তাছাড়া, কর্মীদের চাকুরীর অনিশ্চয়তা দূর, চাকুরীর উন্নয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মীদের অংশগ্রহণ, পারিতোষিক ও পুরস্কার প্রদান,দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে আলোচনার মাধ্যমে মানসিক চাপ কমানো যায়।

উপসংহার: ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈশ্বিক কারণে বর্তমানে মানুষের মানসিক চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। মানসিকচাপ যদি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তা হলে একজন মানুষ তার ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধাগ্রস্থ হয় এবং কোন প্রতিষ্ঠানও তার স্বাভাবিক গতিতে চলতে পারে না। এ প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষের/কর্মীর ব্যক্তি জীবন ও পারিবারিক জীবনকেও অসহনীয় করে তুলে। অতএব প্রতিটি মানুষেরই মানসিক চাপ প্রশমন করা অত্যাবশীয় বলে আমি মনে করি।

তথ্য সূত্র:
মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা- মো. শাহ্ আলম, মীর সাজ্জাদ আলী
-- সুশান্ত রায় চৌধুরী, গাজী শাহ্ আল-হেলালী
-- মোহ: আব্দুস সালাম
Organizational Behavior -Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge,Neharika Vohra
Leadership and Management Training materials by Sr. Gloria OLS
ডা: আলমগীর মতি কর্তৃক লিখিত প্রবন্ধ - বাংলাদেশ প্রতিদিন (তারিখ ২৩ জুলাই, ২০১৩)॥

লেখক : এনজিও কর্মকর্তা, যুব সংগঠক

কিডনি রোগের লক্ষণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধে করণীয়

কিডনি মানুষের শরীরের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ এটা সবারই জানা। ব্যক্তির শরীরে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়ার ফলে যে বিষাক্ত পদার্থ জমা হয়ে থাকে, সেগুলোকে প্রস্রাবের আকারে শরীর থেকে বের করে দেওয়াই কিডনির প্রধান কাজ। এছাড়াও কিডনি লোহিত কণিকা তৈরিতেও ভূমিকা রাখে।
শরীরে যতো হাড় আছে, সেগুলোকে মজবুত করাও কিডনির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করা, রক্তের মধ্যে বর্তমান বিভিন্ন লবনের ভারসাম্য রক্ষা করা, শরীরের বিভিন্ন এসিড এবং ক্ষারের ভারসাম্য আনয়ন- এ সবই অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে পালন করে চলেছে দুই কিডনি।

কিডনি কী কারণে অসুস্থ হয়

বিভিন্ন কারণে আমাদের কিডনি অসুস্থ হতে পারে। যেমন-

১.কিডনি ফেইলর বা কিডনি বিকল
২. ধীরগতির কিডনি বিকল
৩. কিডনিতে ইনফেকশন বা প্রস্রাবের ইনফেকশন
৪. উচ্চ রক্তচাপজনিত কিডনি রোগ
৫. ডায়াবেটিসজনিত কিডনি রোগ
৬. পাথরজনিত কিডনি রোগ
৭. প্রস্রাবে বাধাজনিত কারণে কিডনি রোগ ইত্যাদি।

ধীরগতির কিডনি রোগ

এখন ধীরগতির কিডনি রোগ নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। যদি কিডনি কোনো কারণে রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়, তবে ধীরে তার ক্ষয় চলতে থাকে। ক্রমান্বয়ে ক্ষতির এই প্রক্রিয়া যদি টানা দুই বা ততোধিক মাস ধরে চলতে থাকে, তাহলেই ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা ধীর গতির কিডনি রোগ দেখা দিতে পারে। এতে ধীরগতিতে কিডনির কার্যকারীতা ব্যাহত হয়, এমনকি কিডনির মূল গঠনও আস্তে আস্তে ক্ষয় হতে থাকে।
প্রশ্ন হলো, কীভাবে কিডনির এই ক্ষয় রোধ করা যায়। আসলে, কিডনি রোগ হলো নীরব ঘাতক বা সাইলেন্ট কিলার। এর মানে হচ্ছে, যতোক্ষণ পর্যন্ত না কিডনির ৭০ থেকে ৮০ ভাগ (শতকরা) নষ্ট না হচ্ছে, ততোক্ষণ পর্যন্ত শরীরে বিশেষ কোনো ধরনের উপসর্গ দেখা যায় না। অতি সঙ্গোপনে, আস্তে আস্তে চলতে থাকে কিডনির সর্বনাশ। কিন্তু যখন, শেষমেষ উপসর্গ দেখা দেয়, তখন এটা প্রতিরোধ করার আর কোনো উপায় থাকে না।

কিডনি ফেইলর প্রতিরোধ করতে হলে কী করবেন

মূলত, কিডনি রোগের ঝুঁকির মধ্যে যারা আছেন, তাদের খুঁজে বের করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তাদের কিডনি সুস্থ আছে কি না।
যারা এই রোগের ঝুঁকির মধ্যে বসবাস করেন তারা হলেন-

১. যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে
২. যাদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে
৩. যাদের কখনো নেফ্রাইটিস বা কিডনি ইনফেকশন হয়েছে
৪. যাদের কিডনিতে কখনো পাথরজনিত রোগ হয়েছে
৫. যাদের প্রস্রাবে কখনো বাধাজনিত রোগ হয়েছে
৬. যারা কোনো কারণে দীর্ঘদিন বেদনা নাশক ঔষধ খেয়েছেন, বা কোনো ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছেন
৭. শিশুকালে যাদের কিডনি রোগ হয়েছে এবং
৮. যাদের বংশে ডায়াবেটিকস, উচ্চ রক্তচাপ এবং কিডনি রোগের পূর্ব ইতিহাস আছে। এরা সবাই ঝুঁকিপূর্ণ রোগী। এদের খুঁজে বের করাই প্রথম ও প্রধান কাজ। বছরে অন্তত দুইবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে, তাদের কিডনির কার্যকারিতা ঠিক আছে কি না। প্রাথমিক অবস্থায় তারা কিডনি রোগে আক্রান্ত আছেন কি না, তাও পরীক্ষা করা জরুরি। এছাড়া, যাদের বয়স পঞ্চাশের উপরে, বছরে

অন্তত একবার তাদের পরীক্ষা করে কিডনির অবস্থা দেখে নেওয়া উচিত।

কী কী পরীক্ষা করতে হবে

কোনো ব্যক্তি কিডনি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন কিনা, কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা তা শনাক্ত করতে পারি। যে কোনো ল্যাবরেটরিতেই এই পরীক্ষাগুলো করানো সম্ভব। সাধারণত, তিনটি জিনিস পরীক্ষা করতে হয়-

প্রস্রাবের পরীক্ষা

প্রস্রাবের মাধ্যমে কোনো প্রোটিন বা এলবুমিন যাচ্ছে কি না- এটা পরীক্ষা করে দেখা হয়। যদি বেশি পরিমাণে প্রোটিন না যায়, তবে দেখতে হবে স্বল্প পরিমাণে তা যাচ্ছে কি না- একে বলে মাইক্রো অ্যালবুমিন। যখন থেকে মাইক্রো অ্যালবুমিন যাওয়া শুরু হয়েছে, ঠিক সেই সময় থেকে যদি চিকিৎসা করা যায়, তবে কিডনি রোগ সম্পূর্ণ নিরাময় হয় এবং কিডনি বিকল থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়। এই জন্যেই মাইক্রো অ্যালবুমিনকে বলা হয়, কিডনি রোগের অশনি সংকেত। উচ্চ রক্ত চাপের বিভিন্ন ওষুধের মাধ্যমে মাইক্রো অ্যালবুমিন ইউরিয়া বা প্রস্রাবে মাইক্রো অ্যালবুমিন যাওয়া রোগের চিকিৎসা করা যায়।

রক্তের পরীক্ষা

রক্তের একটা উপাদান হলো ক্রিয়েটিনিন। রক্তে ক্রিয়েটিনন'র পরিমাণ, রোগীর উচ্চতা, বয়স ও ওজন- এই কয়টি হিসাব থেকে একটি সমীকরণের মাধ্যমে কিডনি রোগের বিভিন্ন পর্যায় ভাগ করা যায়। ১০০ ভাগের মধ্যে কিডনি কত ভাগ কাজ করছে, তার উপর ভিত্তি করে কিডনি রোগীদেরকে পাঁচটি পর্যায়ে বা স্টেজ-এ ভাগ করা যায়।

১. ১ম পর্যায় যাদের কিডনি কার্যকারিতা ৯০ ভাগ-এর ওপরে।

২.২য় পর্যায় কিডনির কার্যকারিতা ৬০-৮৯ ভাগ।

৩.৩য় পর্যায় ৩০-৫৯ ভাগ।

৪. ৪র্থ পর্যায় ১৫-২৯ ভাগ।

৫. ৫ম পর্যায় যাদের কিডনির কার্যকারিতা ১৫ ভাগের নিচে।

যারা এই পঞ্চম পর্যায়ের রোগী, অর্থাৎ যাদের কিডনির কার্যকারিতা ১৫ ভাগের নিচে, তাদের ক্ষেত্রে একমাত্র ডায়ালাইসিস বা কিডনি প্রতিস্থাপন ছাড়া আর কোনো গতান্তর নেই। এইজন্যেই, রক্তের ক্রিয়েটিনিন থেকে এই পরীক্ষার মাধ্যমে রোগী কোন পর্যায়ে আছে তা বের করে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করালে কিডনি বিকল প্রতিরোধ করা যেতে পারে। প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পর্যায়ের রোগীরাও চিকিৎসার ফলে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠতে পারেন। ৪র্থ পর্যায়ের রোগীদের পুরোপুরি নিরাময় না করা গেলেও, কিডনি বিকল হয়ে যাওয়াকে বিলম্বিত করা সম্ভব হয়। কাজেই, এই পরীক্ষাগুলো রোগ শনাক্ত করে তা প্রতিরোধ করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যান্য পরীক্ষা

কিডনিতে পাথর বা প্রস্রাবে বাঁধাজনিত রোগ থেকে থাকলে তা শনাক্ত করার জন্যে আলট্রসনোগ্রাফি করা হয়ে থাকে।

কিডনি রোগের প্রতিকার

যাদের কিডনিতে কোনো না কোনো সমস্যা রয়েছে অথবা যারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন, তাদের রোগমুক্তির জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা রয়েছে।

যাদের উচ্চরক্তচাপ, ডায়াবেটিস, নেফ্রাইটিস আছে- তাদের কিডনি রোগের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। আমাদের দেশে শতকরা ৮০ ভাগ কিডনি এই তিন কারণে নষ্ট হয়ে থাকে। এই তিনটি রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেই শতকরা ৮০ ভাগ কিডনি রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

এছাড়া, যাদের ঘনঘন কিডনিতে ইনফেকশন হয়, যাদের পাথরজনিত রোগ আছে, যাদের কিডনিতে বাধাজনিত রোগ আছে, তাদের অতি সহজেই চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় সম্ভব। একটু সতর্কতাই কিডনি ফেইলর থেকে মুক্তি এনে দিতে পারে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখুন

রোগীদের প্রতি একনিষ্ঠ পরামর্শ হচ্ছে, যাদের ডায়াবেটিস রয়েছে, তারা তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখুন। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন, অতি-ওজন শরীরের জন্যে ক্ষতিকর। রক্তচাপই বলুন বা ডায়াবেটিস- সবই শুরু হয় বেশি ওজন থেকে। এছাড়া কোলেস্টেরল বেড়ে গিয়ে হৃদপিণ্ড এবং রক্তনালীর রোগ হতে পারে। শতকরা ৩০ ভাগের বেশি কিডনি রোগ হয় ওজন বৃদ্ধিজনিত কারণে।

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখুন

যাদের উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, তারা তা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখবেন।

কোলেস্টেরল কমান

এবারে বলি কোলেস্টেরলের কথা। যাদের রক্তে কোলেস্টেরল এবং এর অন্যান্য প্রকার, যেমন টাইগ্লিসারাইড, এলডিএল বেশি থাকে, সেসব ক্ষেত্রে এগুলো নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে খাদ্যাভাস পরিবর্তনের বিকল্প নেই। চর্বিজাতীয় খাবার বর্জন সর্বোত্তম; মাছের চর্বি খাওয়া যেতে পারে, এতে কোনো অসুবিধে নেই, কিন্তু চিংড়ি মাছের মাথা এবং মাছের মগজ না খাওয়াই ভালো।

নিয়মিত ব্যায়াম

কিডনি ভালো রাখার আরো একটা ভালো উপায় হলো নিয়মিত ব্যায়াম। নিয়মিত ব্যায়ামে কোলেস্টরল যেমন নিয়ন্ত্রণে আসে, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণ হয়। যত্র-তত্র অল্প দূরত্বের জন্যে রিকশা বা গাড়িতে না চড়ে হাঁটার অভ্যাস এইসব ক্ষেত্রে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। একটি পরীক্ষায় দেখা গেছে, জাপানে যারা সুউচ্চ পাহাড়ি এলাকায় বসবাস করে, তারা সবচেয়ে দীর্ঘায়ু, কেননা তারা বেশি হাঁটেন।

ধূমপান পরিহার করুন

বাকি রইলো ধূমপান। ধূমপান পরিহার করতেই হবে। ধূমপান একদিকে যেমন ক্ষতি করে কিডনির, অন্যদিকে রক্ত চাপ বাড়িয়ে দেয়, ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত করে তোলে, ব্রেইনের কার্যকারিতা নষ্ট করে, মানুষের জীবনী শক্তি কমিয়ে দেয় এবং ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

কিডনি রোগের চালচিত্র

কিডনি রোগ ব্যাপক ভয়াবহ কিন্তু প্রতিরোধযোগ্য। এ বছর কিডনি দিবস সারা পৃথিবীজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। কারণ আর কিছুই নয়, কিডনি রোগী সংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি। শুধুমাত্র ধীরগতির কিডনি রোগ বা ক্রনিক কিডনি রোগে ভুগছে প্রায় ৫০ কোটি লোক। সমস্ত বিশ্বে প্রতি ১০ জনে ১ জন ক্রনিক কিডনি রোগী। আমাদের দেশে এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, প্রায় দুই কোটি লোক কোনো না কোনো কিডনি রোগে ভুগছে। প্রতি ঘণ্টায় ৫ জন করে ব্যক্তি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে কেবল কিডনি ফেইলরের শিকার হয়ে। এ দেশে কিডনি রোগে আক্রান্ত প্রায় ৩৫ লাখ শিশু। কিডনি রোগের চিকিৎসা এতই ব্যয়বহুল, শতকরা পাঁচভাগ লোকেরও সামর্থ নেই চিকিৎসা চালিয়ে নেওয়ার। সেজন্যে আজ বিশ্বজুড়ে যে শ্লোগান, তা হলো কিডনি রোগ প্রতিরোধ করতে হবে, চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম এবং একমাত্র উপায়।

কেনো কিডনি রোগ ভয়াবহ- এ প্রসঙ্গে আরো দু'একটি কথা বলতে হয়। আমরা কিডনি রোগীদের ৫টি পর্যায়ে ভাগ করি। যারা ১ম থেকে ৩য় পর্যায়ের মধ্যে থাকেন, তারা জানেনই না যে তাদের কিডনি রোগ হয়েছে। কিন্তু এই স্বল্পমাত্রার কিডনি রোগের জন্যে তাদের হার্ট ফেইলর হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। অর্থাৎ কিডনি রোগের কারণে হতে পারে হার্ট অ্যাটাক। এ জন্যেই কিডনি রোগকে বলে ডিজিজ মাল্টিপ্লায়ার বা রোগের গুণিতক। এর মানে হলো, কিডনি রোগ, অন্যান্য রোগকে নিমন্ত্রণ করে আনে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, যাদের স্বল্পমাত্রায় ধীরগতির কিডনি রোগ চুপিসারে আক্রমণ করে বসে আছে, তাদের মাঝে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা সাধারণ মানুষের চেয়ে দশ গুণ বেশি। আর যাদের কিডনি ইতোমধ্যেই বিকল হয়ে গেছে, তাদের ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা শতগুণ। যদি কিডনি রোগ প্রতিরোধ করা যায়, তবে হার্ট অ্যাটাকের মতো মারাত্মক রোগের সম্ভাবনাও হ্রাস পায়। স্বল্প মাত্রায় হলেও, কিডনি রোগের চিকিৎসা করানো খুবই জরুরি। আমাদের দেশে এই রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে কিছু সংগঠন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো 'কিডনি অ্যাওয়ারনেস মনিটরিং অ্যান্ড প্রিভেনশন সোসাইটি' বা KAMPS। কিডনিরোগ আছে কিনা, তা শনাক্ত করার পাশাপাশি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পেতে পারেন KAMPS থেকে।

তথ্যসূত্র : *প্রফেসর এম এ সামাদ, অতিথি লেখক: বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর.কম॥*

https://banglanews24.com/lifestyle/news/bd/917157.details.

বৈচিত্রময় আমেরিকা

শিউলী রোজলিন পালমা

পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে আমেরিকাই সবার উপরে, এমন একটি ধারণা আমার মধ্যে খুব ছোট বেলা থেকেই শুরু হয়েছে। আমি বড় হয়েছি গাজীপুর জেলার তুমিলিয়া ইউনিয়নের চড়াখোলা গ্রামে। ১৯৭৫/৭৬ খ্রিস্টাব্দ, যখন আমি প্রাইমারি স্কুলে পড়ি, তখন আমাদের গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক জাহাজে চাকুরি করতেন, একজন চাকুরি করতেন লন্ডনে, একজন জাপানে ও একজন আমেরিকায়। পরবর্তীতে অনেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চাকুরি করেছেন। তবে যিনি আমেরিকায় চাকুরি করতেন, তার বিষয়েই সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলাপ হতো। তাকে ডাকা হতো 'ডলার' নামে। হয়তোবা টাকার তুলানায় 'ডলারের' তেজী অবস্থার কারণেই এমন নামকরণ হয়েছিল। তবে বাংলাদেশের টাকার তুলনায় ডলারের মূল্যমান সম্পর্কে তখন আমার কোন ধারণা ছিল না, শুধু এমনই একটি উপলব্ধি ছিল যে আমেরিকাই সর্বোচ্চে ও সবচেয়ে আকাঙ্খিত।

সেই আকাঙ্খিত আমেরিকায় আমার দুই মেয়ে অন্তরা ও শ্রেয়ার অবস্থানের কারণে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আমি পাঁচবার ভ্রমণ করেছি। ৩,৭৯৬,৭৪২ বর্গমাইল আয়তনের পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দেশ যুক্তরাষ্ট্র বা আমেরিকা। এখানে রয়েছে ছোট-বড় ৫০টি অঙ্গরাজ্য। জাতিগত ও প্রকৃতিগত বৈচিত্র ধারণকারী আমেরিকার বিশালত্ব, শক্তিমত্তা, বিচিত্রতা ও অভিনবত্ব, সারাজীবন আমেরিকায় বসবাস করেও কতটা অনুধাবন করা যায়, সেটা একটা বিরাট প্রশ্ন। তবুও আমি আমার স্বল্প সময়ের ভ্রমণে আমেরিকাকে যেমন দেখেছি, সেটাই আজ লিখতে বসে গেলাম। আমার ভ্রমণে আমি দুটি পরিবেশে অবস্থান করেছি, একটি হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকা, যাকে বলা হয় ইউনিভার্সিটি ভিলেজ। অন্যটি হল সর্বসাধারণের জন্য নির্মিত আবাসিক এলাকা। যাকে আমেরিকাবাসীগণ বলে থাকেন নেইবারহুড (Neighborhood)।

নেইবারহুড ও ইউনিভার্সিটি ভিলেজে মানুষের জীবনযাপনে কিছুটা পার্থক্য আছে। তবে আমেরিকার ছোট-বড় শহর, শহরতলি বা গ্রাম সব জায়গাতেই সুযোগ সুবিধা প্রায় একই রকম। সব জায়গার প্রকৃতি সুন্দর, সর্বত্র আছে পরিচ্ছন্নতার ছোঁয়া, রাস্তাঘাট প্রশস্থ, ফাঁকা রাস্তায় চলাচলে সুবিধা, শীত-গ্রীষ্মে আমারদায়ক জীবন যাপনের জন্য সব উপকরণ হাতের কাছেই পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়, দৈনন্দিন কাজ সহজ ও আরামদায়ক করার জন্য পাওয়া যায় সব রেডিমেড জিনিসপত্র। এখানে রয়েছে জোরদার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যেকোন বিপদে পুলিশের সাহায্য পাওয়া যায় অতি দ্রুত। সব জায়গায় আছে মানসম্পন্ন বাজার, মার্কেট, স্কুল, হাসপাতাল সুতরাং কোন বিষয়েই রাজধানীতে দৌড়াতে হয় না। প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুন রয়েছে সবার জন্য যা সবাই মানতে বাধ্য এবং নিয়ম মানার এ বাধ্যবাধকতাই আমেরিকান নাগরিকদের জীবনকে করেছে সহজ, স্বাধীন ও ভীতিমুক্ত।

ইউনিভার্সিটি ভিলেজে থাকে ইউনিভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্র/ছাত্রী ও তাদের পরিবার। ব্যাচেলর ছাত্ররা সাধারণত ইউনিভার্সিটির হলে থাকে আর বিবাহিত ছাত্র/ছাত্রীরা তাদের পরিবার নিয়ে ইউনিভার্সিটি ভিলেজের বিভিন্ন ফ্ল্যাটে থাকে। ইউনিভার্সিটি ভিলেজে পৃথিবীর সব দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের বসবাস- আমেরিকান, আফ্রিকান, বাংলাদেশী, ইন্ডিয়ান, এরাবিয়ান, চাইনিজ, জাপানিজ সব। তবে ক্লাশের বাইরে এরা নিজের দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে সময় কাটাতে পছন্দ করে। প্রায় সব দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের আলাদা আলাদা সংগঠন আছে। এসব সংগঠনের অধীনে তারা অনেক প্রোগ্রাম করে। এতে প্রথমবারের মত বিদেশে এসে একাকীত্বের সমস্যা কিছুটা লাঘব হয়। ইউনিভার্সিটির বাঙালী সংগঠন পহেলা বৈশাখ, বিজয় দিবস, ঈদ, পূজা ও বড়দিনে উৎসব করে এবং সামারে ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্ণামেন্টেরও আয়োজন করে। এছাড়া ছাত্রছাত্রী পরিবারের শিশুদের জন্মদিনে, নতুন শিশুর জন্ম হলে বা দম্পতিদের বিয়েবার্ষিকীতে বিভিন্ন বাসায় দাওয়াত থাকে। এসব দাওয়াত সাধারণত কেউই মিস করতে চায় না কারণ দেশে যত আরামেই তারা বড় হোক না কেন বিদেশে এসে তাদের রেঁধে খেতে হয়। আর দাওয়াতে গেলে বহুদিন পর দেশীয় ভর্তা, শুটকি, পোলাও, রোস্ট, সুস্বাদু ডেজার্ট তৃপ্তি করে খাওয়ার সুযোগ হয়। এসব ছাত্রছাত্রীদের মনে আনন্দ ও উদ্বিগ্নতা দুটোই সমপরিমাণে থাকে। আনন্দ এজন্য যে সবচেয়ে আকাঙ্খিত দেশের ইউনিভার্সিটিতে তারা পড়ার সুযোগ পেয়েছে আর উদ্বিগ্ন হল এজন্য যে পড়া শেষে এ দেশে কিভাবে স্থায়ী হবে। তাদের আড্ডায় থাকে পড়াশোনা, পরীক্ষা, গবেষণা, নামকরা জার্নালে গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ, থিসিস ইত্যাদি। আড্ডায় আরো থাকে কার মাস্টার্স বা পিএইচডি কবে শেষ, কে কোথায় চাকুরীর জন্য এ্যাপ্লাই করছে, কার চাকুরী হয়ে গেছে, কে চাকুরী নিয়ে কোন্ স্টেটে চলে যাচ্ছে, চাকুরী পাওয়ার পর সুডেন্ট ভিসা থেকে জব ভিসায় যেতে কি করতে হবে -এসব। যারা স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে আসে তাদের কষ্ট কম কারণ তাদের টিউশন ফি দিতে হয় না, আবার টিচার্স এসিস্ট্যান্টশিপ বা রিসার্চ এসিস্ট্যান্টশিপের জন্য তারা বেতন পায়, যা দিয়ে তাদের থাকা খাওয়ার খরচ চলে। যারা নিজেদের পয়সায় পড়তে আসে তাদের অনেক কষ্ট করতে হয়।

কারণ ইউনিভার্সিটির টিউশন ফি ও থাকা খাওয়ার খরচ এত বেশি যে দেশ থেকে বাবা-মা তার পুরোটা পাঠাতে পারেন না। তাই তারা বেশি সময় কাজ করে, কম খেয়ে পড়া চালিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে। অনেকে হতাশ হয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দেয়। তবে স্কলারশিপ নিয়ে আসুক বা নিজের খরচেই পড়তে আসুক না কেন, এদের সবাই অনেক হিসাব করে চলে, প্রতিটা ডলার হিসাব করে খরচ করে। ছাত্র-ছাত্রীরা পারতঃপক্ষে নতুন ফার্নিচার কিনে না, তারা পুরানো ছাত্রদের রেখে যাওয়া চেয়ার, টেবিল, খাট, সোফা ঘরে এনে ব্যবহার করে। ইউনিভার্সিটিতে এমন সেন্টার আছে যেখানে পুরানো ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ফার্নিচার রাখতে পারে এবং সেখান থেকে নতুনরা সেসব সংগ্রহ করতে পারে। আমেরিকায় গিয়ে প্রথমেই তারা একটা গাড়ি কেনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। কারণ সবকিছুর দূরত্ব অনেক বেশি এবং সব জায়গায় পাবলিক ট্রান্সপোর্ট নেই। তাই গাড়ি ছাড়া চলাচলা করা কঠিন। তাই তারা চেষ্টা করে পড়াশুনার দ্বিতীয় বছরে সিনিয়র ভাইদের একটি গাড়ি কিনে নিতে। সবচে ভাল লাগে প্রায় সব ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন মণ্ডলীর গির্জা থাকে। কাথলিক গির্জাও থাকে হাঁটা দূরত্বে। তাই কাথলিক ছাত্র/ছাত্রীরা চাইলেই নিয়মিত গির্জায় যোগ দিতে পারে। আমি দু'টি ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের গির্জায় মীসা শুনেছি। গির্জাগুলো ইউনিভার্সিটি ছাত্র, শিক্ষক, স্টাফ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের দিয়ে ভরপুর থাকে। যা দেখলে সত্যিই মনটা ভরে যায়।

আমার বড় মেয়ে অন্তরা ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস আরলিংটনে পিএইচডি করছে, তাই সে পরিবার নিয়ে ইউনিভার্সিটি ভিলেজে থাকে। ছোট মেয়ে শ্রেয়া ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি পারডো ইউনিভার্সিটি ইন্ডিয়ানপোলিশে মাস্টার্স শেষ করে এখন জব করে। সে বর্তমানে আমেরিকার ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ফিন্ডলে থাকে। তার বাড়িতে থাকার সুবাদে আমি আমেরিকার নেইবারহুডের অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পেয়েছি।

আমেরিকার নেইবারহুডগুলো অনেক সুন্দর, অনেক গুছানো। নেইবারহুডের ভেতর দিয়ে চলে যাওয়া রাস্তার দুদিকে নির্মিত বাড়িগুলোর ডিজাইন প্রায় একই রকম। সব বাড়ির সামনে পেছনে খোলা উঠান। সামনের উঠানের মাঝ বরাবর থাকে প্রশস্থ ড্রাইভওয়ে। সব বাড়ির সামনের পেছনের উঠানে আছে একটি দুটি বড় গাছ, আছে কিছু ঝোপজাতীয় চিরহরিৎ গাছ, আর আছে নানা রঙ্গিন ফুলের সমারোহ । চিরহরিৎ গাছগুলো নানা ঢং- এ, নানা ডিজাইনে কেটে রাখা যা দেখতে খুবই আকর্ষণীয়। সামারে প্রকৃতি হয়ে উঠে সবুজ। শ্রেয়ার নেইবারহুডে আমি আমাদের দেশের মত এত বৈচিত্রময় গাছ দেখিনি, গুটি কয়েক জাতের গাছই চোখে পড়েছে, এর মধ্যে আছে ম্যাপল, ওক, ক্রিসমাসট্রি, আর দু'একটা নাম না জানা গাছ। কোন কোন বাড়ির উঠানে আছে আপেল, আখরোট, পিচ ও ব্লেনবেরি ফলের গাছ। সামারে ফলন্ত এ গাছগুলো বাড়ির সৌন্দর্য অনেক বাড়িয়ে দেয়। এসময় গাছে গাছে ছোটাছুটি করে কাঠবেড়ালীর দল, কখনও কখনও ছোটাছুটি করতে দেখা যায় খরগোশ ছানা। দিনেরবেলায় পাখির দেখা খুব একটা পাওয়া না গেলেও, সন্ধ্যায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে উড়ে একদিক থেকে অন্যদিকে যেতে দেখা যায়। সামারটাই আমেরিকাবাসীদের জন্য সবচেয়ে উপভোগ্য। সুন্দর আবহাওয়া থাকায় এ সময় প্রতি উইকেন্ডেই থাকে নানা প্রোগ্রাম ও ফেস্টিভাল। মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়ে পিকনিক, ক্যাম্পিং, বেড়ানো নিয়ে। এখানকার প্রতিটি শহরেই আছে পার্ক, লেক, খেলার মাঠ ও আরো অনেক বিনোদন কেন্দ্র, শিশুদের জন্য প্লে-গ্রাউন্ড তো আছেই। এসময় স্কুলের বাইরেও বাচ্চারা যায় নানা কোচিং- এ যেমন ফুটবল (সকার), ক্যারাটি, পিয়ানো আরো কত কী! শীতে এসব কোচিং সাধারণত বন্ধ থাকে। সামারের বিকালে অনেকেই পাড়ার ভেতরে হাঁটতে বের হয়, যুব বয়সের বাবা-মায়েরা স্ট্রলারে তাদের ছোট্ট শিশু সন্তানদের নিয়ে বের হয়, স্কুল পড়ুয়া শিশুরা স্কুটি, স্কেটিং বুট বা সাইকেল নিয়ে বের হয়। চলাচলের পথে চেনা অচেনা সবাই সবাইকে হাই- হ্যালো বলে, কখনও কখনও দুইতিন বাড়ির লোকজন একসাথে জড়ো হয়ে গল্প করে। এ সময় উইকেন্ডের বিকালগুলোতে অনেকেই তাদের উঠানের ঘাস কাটা ও বাগান পরিচর্যায় ব্যস্ত থাকে। এ নেইবারহুডের কোন বাড়ির পেছনের উঠানে আমি চাষাবাদ হতে দেখিনি, যেমনটা দেখেছিলাম মেরীল্যান্ডে আমার মেজদির বাসায় বেড়াতে গিয়ে।

তবে এখানকার প্রায় সব বাড়িতেই পোষা প্রাণী আছে, পোষা কুকুর তো আছেই। কুকুর পোষা যেন এখানকার কালচারেরই অংশ। পোষা কুকুরগুলোকে সুস্থ রাখতে বাইরে বের করতেই হয়। তাই সবাই যার যার পোষা কুকুর নিয়ে হয় সকালে, না হয় বিকালে পাড়ার বিভিন্ন রাস্তায় হাঁটে। কুকুরগুলোর সাইজ যে কী! কোনটা ধবধবে সাদা, কোনটা কুচকুচে কালো, কোনটার সাদা গায়ে কালো ফুটকি, কোনটা অতিমাত্রায় লোমশ, কোনটির লোম নেই বললেই চলে, কোনটা ভালুকের মত বিশাল আবার কোনটা একদমই ছোট্ট পাপ্পি। সব পরিবারে পোষা কুকুর থাকলেও আমাদের দেশের মত বেওয়ারিশ কুকুর একটিও নেই। শ্রেয়ার নিকটতম প্রতিবেশী খ্রীষ্টিনের একটি পাপ্পী একদিন দরজা খোলা পেয়ে এমন ছুট দিয়েছিল যে, খ্রীষ্টিন ওর পিছন পিছন কিছুক্ষণ ছুটে হয়রান হয়ে থেমে গিয়েছিল। পাপ্পী বিভিন্ন বাড়ির বেড়ার ফাঁক গলে কেবল ছুটছে তো ছুটছেই। অবশেষে পাড়ার এক কিশোর ওকে ধরতে সমর্থ হলো এবং কোলে করে নিয়ে এসে খ্রীষ্টিনকে দিয়ে গেল। আমি শ্রেয়া কে বললাম, 'শ্রেয়া, পাপ্পীটা যদি অনেক দূরে চলে যেত, আর যদি পাওয়া না যেত, তবে কি হতো?' শ্রেয়া বলল, 'মা এটা সম্ভব না। মালিকবিহীন কুকুর দেখা গেলে নেইবারহুডের ম্যাসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দেয়া হবে, পুলিশে জানানো হবে এবং পুলিশ এসে নিয়ে যাবে। মালিকবিহীন কুকুরটিকে পুলিশ নিয়ে যাবে এজন্য নয় যে কুকুরটি কারো ক্ষতি করবে, বরং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কুকুরটি না খেয়ে থাকবে, শীতে কষ্ট পাবে।

আমেরিকা। দেশটা অনেক বড়, সে তুলনায় মানুষের সংখ্যা কম, তাই সবকিছুই পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। যথেষ্ট জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে এক একটি নেইবারহুড, নেইবারহুডের বাড়িগুলো এমনভাবে বানানো যাতে সব বাড়িতে সকালে - বিকালে, পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিক থেকে পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ করতে পারে। তবে বাইরে যত সুন্দর বাতাসই থাকুক না কেন ঘরে বসে সে বাতাস পাওয়ার সুযোগ নেই। সব বাড়ি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। সামারের সুন্দর আবহাওয়া পরিবর্তন হতে শুরু করে অক্টোবরের প্রথম থেকেই। অক্টোবরের শুরু থেকেই দ্রুত রং বদলাতে থাকে প্রকৃতি। একদিকে বাগানের রঙ্গিন সতেজ ফুলগুলো ম্লান হতে থাকে অন্যদিকে ছোট বড় সব সবুজ গাছ নানা রঙে রঙ্গিন হতে থাকে। হলুদ, কমলা, গোলাপি, লাল রঙে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে গাছগুলো, মনে হয় পুরো গাছটাই যেন একটি বিশালাকার ফুল। আগুন রঙে রঙ্গিন, মুগ্ধতা ছড়ানো এ গাছগুলোর অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা করা যায় না, কেবল বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ভাবতে হয়, কে তুমি, কোথায় বসে, খেলছ এ রঙের খেলা? অল্প কিছুদিন রঙের দাপট দেখিয়ে পাতায় ঠাসা গাছগুলো শূন্য হতে থাকে। সব বাড়ির সামনের ও পিছনের উঠান ঝরা পাতায় ভরে উঠে। এ সময় ঝড়ো হাওয়া বইলে যেদিকে তাকানো যায়, চোখে পড়ে শুধু ঝরা পাতার উড়াউড়ি। নভেম্বরের মাঝামাঝিতে প্রায় সব গাছ, পাতা হারিয়ে কাঠি সর্বস্ব হয়ে পড়ে। তবে সব কিছু নিষ্প্রভ হয়ে গেলেও শুধু ক্রিসমাস টি ও কিছু চিরহরিৎ ঝোপ আমেরিকার বুকে সবুজকে বাঁচিয়ে রাখে।

নভেম্বরের শুরু থেকেই সামারের সুন্দর আবহাওয়া খারপ হতে থাকে। তীব্র শীতে, প্রয়োজন ছাড়া কেউই বের হয় না। সবার গায়ে উঠে আসে ভারী জ্যাকেট, টুপি, হাত মোজা। নভেম্বরের শেষের দিক তুষারপাত শুরু হয় তবে ডিসেম্বরের শেষে ও জানুয়ারিতে প্রায় ২৭/২৮ ইঞ্চি তুষারপাত হয় এবং এসময় তাপমাত্রা

নেমে যায় প্রায় -২৫/৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এ হল বিচিত্র ঋতু বৈচিত্রের আমেরিকা, কখনও মন পাগল করা রঙ্গিন প্রকৃতি কখনও সাদা তুষারে আবৃত হিমশীতল জনপদ।

নেইবারহুডে প্রতিবেশিদের মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠে, তারা পরিবারের শিশুদের জন্মদিন ও অন্যান্য উৎসবে একত্রে মিলিত হয়ে আনন্দ করে। যদিও তারা কেউই স্থায়ী প্রতিবেশি নয়। কে কবে কোথায় চলে যাবে তার কোন ঠিক নেই। এখানে নিজের মত করে বাড়ির ডিজাইন পরিবর্তন করা যায় না, তবে বাড়ির ভেতরে ছোটখাট পরিবর্তন করা যায়, যেমন রান্নাঘরের কেবিনেট পছন্দ হচ্ছে না, পছন্দমত কেবিনেট করে নিল। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়েছে, আরেকটি রুম দরকার, বানানো যাবে না। সুতরাং এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে অন্য বাড়িতে, স্বামী-স্ত্রীর ডিভোর্স হয়েছে, বাড়ি ছেড়ে যার যার মত চলে গেছে নতুন বাড়িতে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার বেশি শীত সহ্য হচ্ছে না, ওহাইওর বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে ফ্লোরিডা, নতুন চাকুরী হয়েছে ভিন্ন স্টেটে, বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে নতুন জায়গায়। এমনই জীবন, আমাদের দেশের মত স্থায়ী ঠিকানা বলে কিছু যেন নেই। তাদের পরিচয় হল সোস্যাল সিকিউরিটি কার্ড, এ কার্ডই বলে দেয় যে, সে আমেরিকার নাগরিক এবং এ কার্ডই অধিকার দেয় তাকে সকল রাষ্ট্রীয় সেবা পাবার। আবাসিক এ পাড়াগুলোতে কোন দোকানপাট, স্কুল, হাসপাতাল, গির্জা বা অফিস আদালত নেই। তাই এসব জায়গায় যেতে গাড়ি লাগে, হেঁটে যাওয়া কঠিন। প্রায় সব পরিবারেই একাধিক গাড়ি আছে। প্রয়োজনীয় কাজ সারতে একেকজন, একেক দিকে গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ে। তবে সুস্থ থাকার জন্য তারা সময় করে হাঁটে। পাড়ার বাচ্চারা বেশিরভাগই স্কুলবাসে করে স্কুলে যায়। স্কুল বাস প্রতিটি বাড়ির সামনেই দাঁড়ায়। এ কাহিনী দেখে আমি বিরক্ত হই। পাশাপাশি লাগোয়া পাঁচ ছয়টি বাড়ির বাচ্চা একসাথে দাঁড়াতে পারে, তাহলে বাস চালককে বারবার থামার কষ্ট করতে হবে না এবং সময়ও বাঁচবে। কিন্তু তারা বোধহয় মনে করে প্রতিটি বাচ্চারই অধিকার আছে তার বাড়ির সামনে থেকে বাসে উঠার, তাই প্রতি বাড়ির সামনেই বাস থামায়। অনেক বাড়িতেই বয়সের ভারে নুজ্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা একাই থাকে, তাদের ছেলে মেয়েরা পেশাগত কারণে দূরে থাকে। তারা নিজেদের কাজ নিজেরা করে, গাড়ি চালিয়ে ঘুরতে ও বাজার করতে যায়। যতদিন গাড়ি চালাতে পারবে ততদিন তাদের স্বাধীন জীবন অটুট থাকবে, এর পর কি হবে? হয়তো কেয়ার গিভার আসবে নয়তো ওল্ডহোমে যাবে। এমনটাই হয়ে থাকে এখানে।

এখানকার পড়াশোনার পদ্ধতি অনেক সুন্দর। বাচ্চারা দীর্ঘ সময় (প্রায় সাত/আট ঘন্টা) স্কুলে থাকে। যেকোন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষা দিতে, তারা অনেক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে, যেমন ছবি, কাগজ কেটে বিষয় সংশ্লিষ্ট জিনিস পত্র বানানো, এতে সহজেই বিষয়টি বুঝা যায় ও মনে রাখা যায়, মুখস্ত করার প্রয়োজন পড়ে না। এখানকার শিশুদের অভিভাবকগণ জানেন না তাদের শিশুদের পাঠ্য বই কোনটি বা কোন্ বই ফলো করে শিক্ষক তাদের পড়াচ্ছেন। কারণ পাঠ্য বই কখনো বাসায় দেয়া হয় না। বাসায় দেয়া হয়, গল্পের বই। স্কুল থেকে আনা গল্পের বই পড়ে যখনই ফেরত দেয়, তখনই আবার নতুন বই দেয়া হয়, তাই একজন শিশু এক বছরে প্রচুর বই পড়ার সুযোগ পায়। এভাবেই তারা শিশুদের মধ্যে পাঠ্যভ্যাস গড়ে তুলে। স্কুল পড়ুয়া শিশুরা সন্ধ্যা ৭টার মধ্যেই বিছানায় চলে যায়। ঘুমের আগে মা-বাবা তাদের গল্পের বই পড়ে শোনায় এতে শিশুরা বেশিক্ষণ মোবাইল বা ট্যাবে কার্টুন বা ভিডিও দেখার সময় পায় না। তবে এখানে শিশুদের উপযোগী অনেক ভিডিও আছে যা দেখে শিশুরা অনেক কিছু শিখতে পারে। তবে এক্ষেত্রে মা-বাবাকে গাইড করতে হয় যে, শিশুকে কি দেখতে দেয়া হবে এবং কি দেখতে দেয়া হবে না। এখানকার মা-বাবারা অনেক ব্যস্ত থাকে, যাদের দাদা-দিদিমা আছে তারা নাতি নাতনিদের সাপোর্ট দিতে পারে, যাদের কেউ নেই 'ডে-কেয়ার'- ই তাদের একমাত্র ভরসা। অনেক সময় নবজাত শিশুদের লালন পালনের জন্য মা অথবা বাবাকে চাকুরী ছাড়তে হয়। অনেক স্কুল পড়ুয়া শিশু, স্কুল ছুটির সাথে সাথে বাড়ি ফিরতে পারে না, তারা ক্লাশ থেকে 'নেস্টে' (স্কুলের ভেতরেই ডে-কেয়ার সুবিধা) যায়, 'নেস্টে' তারা ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ না তাদের অফিস ফেরতা বাবা- মা তাদের নিতে আসে।

এখানকার পরিবারগুলোর ধরন বোঝা ভার। কিছু পরিবার আছে খুবই সুন্দর, বাবা-মা ও দুটো বাচ্চা অথবা বাবা-মা ও একটি বাচ্চা। এসব পরিবারে দাদা-দিদিমা, মামা- মাসি, কাকা-পিসিমাদের যাতায়াত আছে। আবার কিছু পরিবারে মা ও সন্তান আছে, বাবা নেই, অনত্র থাকে, হয়তোবা বিচ্ছেদ হয়ে গেছে, আবার এমনও পরিবার আছে বাবা, সন্তান ও ঠাকুরমা আছে, মা নেই, আবার কোন পরিবারে বাবা মা উভয়ই আছে, সন্তান চার জন, সন্তানদের মধ্যে বয়সের বিশেষ পার্থক্য নেই, এক্ষেত্রে দেখা যায় দু'জন সন্তান মায়ের, দু'জন বাবার। শ্রেয়ার নেইভারহুডের এক বৃদ্ধার সাথে আমার খানিকটা সখ্যতা হয়েছিল, এ বৃদ্ধা এক নাতনি নিয়ে বিরাট বাড়িতে থাকেন। নাতনির মা বাবা কেন এখানে থাকেন না জানা নেই। একদিন ছোট ছোট দুটি ছেলে শিশুকে নিয়ে এই বৃদ্ধাকে বেড়াতে দেখে জানতে চাইলাম- এরা কারা? তিনি বললেন,- এরা আমার সৎনাতনির বাচ্চা, ওদের মায়ের অপারেশন হয়েছে, তাই ওরা কিছুদিন এখানে থাকবে। বাচ্চাদের একই সাইজ দেখে প্রশ্ন করলাম- এরা কি টুইন? তিনি বললেন, - না, এরা হাফ ব্রাদার। সম্পর্কের এত জটিলতা দেখে আমি আর প্রশ্ন করতে সাহস করলাম না। এধরনের পারিবারিক পরিবেশ, একজন শিশুর স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বিকাশের জন্য কতটা সহায়ক - তা ভাবার বিষয়। এখানকার স্কুলগুলোতে গুরুত্বের সাথে ভদ্রতা, শিষ্টাচার শেখানো হয়, তবে আমি মনে করি বাহ্যিক আচার আচরণ এক জিনিস আর একজন মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে নিজের ভেতরকার আত্মশক্তি কতটা মজবুত হচ্ছে সেটা আরেক জিনিস। প্রতিদিনের বিস্ময়, আনন্দ, বেদনা বা হতাশার ঘটনা সহভাগিতা করার পরিবেশ কি পরিবারগুলোতে আছে? এসব পরিবারের শিশুদের ভেতর কি এ আস্থা জেগে উঠছে যে, আমি ভুল করলেও আমাকে শুধরানোর কেউ আছে, আমি বিপদে পড়লে আমার কথা শুনার মানুষ আছে। এমন উপলব্ধি একজন মানুষকে যে শক্তি দেয়, আমার মনে হয় সে শক্তি জাগ্রত করার জায়গাটিতে কিছুটা ঘাটতি রয়েই গেছে, যার কারণে তরুণ তরুণীদের মাঝে বাড়ছে হতাশা, বিভিন্ন ধরনের নেতিবাচক আসক্তি, সমাজের প্রতি- মানুষের প্রতি ঘৃণা, যার পরিণামে আমরা দেখি নিরপরাধ মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি চালানোর ঘটনা। আমেরিকায় ব্যক্তি স্বাধীনতার ব্যাপারটিও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সন্তানের বয়স ১৮ বছরের বেশি হলে তার উপর কোন জোর করা চলে না। তখন সন্তান ভুল পথে চললেও করার কিছু থাকে না।

তবে সব কিছুর উর্ধ্বে আমেরিকাই বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষের কাছে সবচেয়ে আকাঙ্খিত গন্তব্য। কিন্তু কেন? কারণ বহুবিধ- এখানে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিনোদন কেন্দ্র। কিছু নিয়মনীতির মধ্যদিয়ে আমেরিকা পৃথিবীর সব মানুষকে গ্রহণ করতে এবং তাদের সংস্কৃতির সাথে একীভূত করতে সর্বদাই উন্মুক্ত। কঠিন পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে নিজের সম্ভাবনা বিকাশের ও সফল ভবিষ্যত গড়ার সুযোগ এখানে অনেক বেশি। যে কোন পর্যায়ের মানুষের কাজের সুযোগ রয়েছে আমেরিকায়। এখানে কেউ কারো পূর্বপুরুষদের বংশ মর্যাদা নিয়ে মাথা ঘামায় না, বরং একজন ব্যক্তি তার সম্ভাবনাকে কতটা কাজে লাগাতে পারল সেটাই বিবেচ্য। তাই একজন অভিবাসী এ বিশ্বাস করতেই পারে যে, আমি সাধারণ কাজ করে জীবন কাটালেও, আমার সন্তানেরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা সায়েন্টিস্ট হতে পারবে, আমার নাতি নাতনি দেশের প্রেসিডেন্টও হতে পারবে, যা পৃথিবীর অন্য কোন দেশে হয়তোবা এতটা সহজ নয়। এখানেই আমেরিকা ভিন্ন ও বৈচিত্রময়॥ ❑

ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর!

খ্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন

একটি খোলা প্রশস্থ উঠান। সেখানে ঝলমলে সোনালী-রোদ্দুর নিরন্তর আছড়ে পড়ছে। চারদিকে ঝিরঝিরে বাতাশে দোলায়মান প্রাণবন্ত সবুজ-শ্যামলীমা। উপরে স্বচ্ছ-নীল আকাশ। পাখিরা কিচির মিচির কলকাকলিতে মাতিয়ে রেখেছে উঠানের উদাত্ত-প্রচ্ছদ! আহা কী প্রশান্তির সেই মোলায়েম দৃশ্য!

এ মুহূর্তে আমি এই প্রবাসে নিবিষ্ট হয়ে, ব্যাকুল-চিত্ত নিয়ে আমারই বাড়ির উঠানটি দেখছি আমার সামনে। দেখছি, সত্যই আমি ফিরে গিয়েছি আমার একান্ত নিজের আঙ্গিণায়! দেখছি, আমার উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বুক ভ'রে শ্বাস নিচ্ছি। আর কণ্ঠ ছেড়ে প্রাণের সব ব্যাকুলতা ঝেড়ে উদাত্ত সুরে গান গাইছি, 'একী অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী জননী...!'

আমি বরাবরই আমার গ্রাম, এলাকা সর্বোপরি আমার দেশটিকে একটি খোলা প্রশস্থ-উঠানের অবয়বে দেখেই অনাবিল-স্বপ্ন রচনা করি। আমার সেই নিরবচ্ছিন্ন-স্বপ্নের বুননে থাকে অনেক বিচিত্র রঙের কী দীপ্তিমান-ছড়াছড়ি! আছে সাথে, তার আবহে মোহনীয়-সুরের মূর্চ্ছনা। স্বপ্নের আবাহনে সেই ছবিটা হয় বড়ই জীবন্ত! একেবারে তৃতীয়-নয়নে উপলব্ধি করার মত। আর ইন্দ্রিয়ের সর্বোত্তম-কাঠামোয় বাঁধিয়ে রাখার মতোই। কিন্তু হায়! আমার সাধ্য আর সেই স্বপ্নীল-উঠানের কাছাকাছি বাস্তবতায় নিয়ে যেতে পারে না এই আমাকে! আমি এখন পরবাসী! স্বপ্ন-বিলাসী পরিযায়ী-পাখির মত উড়ে এসে অভিবাসনের খাঁচায় নিজেই নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছি। তাই, স্বপ্নটি আমার পরিপূর্ণতা পাবার আগেই মাঝপথে ভেঙ্গে যায়। একেবারেই চুরমার হয়ে যায়! আর সাথে সাথে আমি থমকে যাই! আহা! কী কষ্ট! কী যাতনা!

এমনও হতে পারতো, এখানে এখন অবস্থান করে আমি যেমন আমার সমাজকে নিয়ে, দেশকে নিয়ে ভাবি, ইচ্ছে করলেই সেই সমাজ ও দেশকে আমূল পাল্টে দিতে পারি। কিন্তু না। এমনটি হয় না! এখানেই আমি দুর্বল। যদিও আমি জানি, মানুষ তার স্বপ্নের সমান উচ্চতায় অবস্থান করে। আমিও তাই করি। তারপরও আমি আমার স্বপ্নকে সামনে রেখে সব দৃশ্যমান সীমাবদ্ধতা ও অনুভূত বাঁধাকে উৎরে যেতে পারি না। আমার স্বপ্ন-সমন্তর সাথে, একই সমান্তরালে দৌড়াতে পারি না আর এই আমি! হায়! কী ব্যর্থ আমি!

আমার অতীত জীবনের ছোট, বড় ভুলগুলো দৃশ্যত এখন পথের বাঁধা হয়ে, কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই আমারই সামনে। আমি বারবার আমার যতো পুরনো ভুলগুলোকে নেড়েচেড়ে খুঁটিয়ে দেখি। ব্যবচ্ছেদ করি তাদের চরিত্র। কখনও আমার মনে হয়, সেই ভুলগুলোর সবই কিন্তু নিছক 'ভুল' নয়। আমার জন্যে সেগুলো অপরাধও বটে! তখন নিজেকে; এই আমি আর ক্ষমা করতে পারি না। এখন আমি সেগুলোর মাশুল এক রকম চড়ামূল্যেই গুনছি কড়ায় গণ্ডায়!

আমি এখন দেখছি, আমার গ্রাম, আমার জনপদ, সর্বোপরি আমার দেশ দ্রুতই পাল্টে যাচ্ছে। আর এই পাল্টে যাওয়ার অভিঘাতের শিকার হচ্ছি আমি এবং শিকার হচ্ছেন আমার আঙ্গিনার বাকী সকলেই। মূলতঃ সারা বিশ্বে এখন পরিবর্তনের যে তুমুল ঝড় বইছে, সেই ঝড়ের তাণ্ডবে আমাদের বাপ-দাদার ভিটে-মাটি, গ্রাম, সমূহ এলাকা দ্রুতই নিজস্ব দৃশ্যপট পাল্টাচ্ছে! আমরা মানুষ, অনেকেই যুগযন্ত্রণার বিভবে এই মাটির শিকড়ের নাড়ির-টান ছিঁড়ে নানান দিকে ছিটকে পড়ছি!। দিগ্বীদিক ছুটছি তো ছুটছি! সাথে আমরা হারাচ্ছি আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। দেশজ কৃষ্টি। পরিবারের প্রিয়জনের সাথে আমাদের রক্তের ও আত্মার সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরছে। ভাঙ্গছে আত্মীয়তার যোগবন্ধনের আবেশে সন্নিহিত সকল মায়ার-বন্ধন। সাথে স্খলন ঘটছে আমাদের নীত-নৈতিকতার। আমাদের কোমল হৃদয় মন দ্রুতই পাষাণ হয়ে যাচ্ছে! প্রশ্ন, এভাবে যেতে যেতে তারপর কোথায় যাবো? পরিশেষে আমরা কোথায় কোন কল্পিত 'গন্তব্যে' গিয়ে দাঁড়াবো? ফলশ্রুতিতে, কোন 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'র শিকলে বন্দী করে রাখছি আমাদের আগামী-প্রজন্মকে!

এখন একান্ত বাধ্য হয়েই আমরা বাপ-দাদার জমি-জিরাত বিক্রি ক'রে দিচ্ছি। কারণ আমরা যুগ-পরিবর্তনের শিকার। আমাদের চির-আপন জমিগুলো ক্রমেই অন্যের হয়ে যাচ্ছে। একেবারেই পর হয়ে যাচ্ছে, স্থাবর অস্থাবর সব! সেগুলোর বুক চীরে ভূমিদস্যুদের সাইনবোর্ড দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। পলি-মায়ের আঁচল তচনচ ক'রে দিয়ে, সব শ্যামলীমা লোপাট ক'রে দিয়ে যন্ত্রের নির্মম কারুকর্মে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আকাশচুম্বী ইট-পাথরের অট্টালিকা স্থাপনা সমস্ত। আম, কাঁঠাল, বাঁশঝাড়ের নান্দনিক অবয়ব নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের থাম, মোবাইলফোনের টাওয়ার। হারিয়ে যাচ্ছে দখিনা বাতাসে দোল খাওয়া বাঁশঝাড়ের এবং অবারিত ধানেখেতের পাটখেতের প্রাণমাতানো দৃশ্য। পাখ-পাখালির কলকাকলি। 'মরি হায় হায়রে ...!'

নগরায়ন ও শিল্পোন্নয়নের তেজস্ক্রিয়ায় ঝলসে যাচ্ছে, প্রজনন ক্ষমতা হারাচ্ছে প্রাণদায়ী সবুজ নিসর্গ। আমার মাতৃভূমি 'বন্ধাত্যের' শিকার হচ্ছে!

মাটির বুক চিরে যন্ত্রদানবের চলাচলের জন্য তৈরী হচ্ছে সেখান দিয়ে, বীভৎস অজগরের মতো কালো পীচঢালা পথ। পাষাণময় সীমানাপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত হয়ে যাচ্ছে আমাদের বিখণ্ডিত-জমিগুলো। আমাদের ধানখেত, সবজি-বাগান, আম-কাঁঠাল, তাল-নারিকেল, কলা-আনারস পেঁপে-লিচু সব, বাগানের আর বাঁশঝাঁড়ের সারি সমস্ত কিছুই সমূলে লুণ্ঠন করে নিচ্ছে ভূমিদস্যুরা!

তারপর এখানে গড়ে উঠছে এবং একনাগাড়ে গড়ে উঠবে বিশাল বিশাল স্থাপনা। কল-কারখানা। বাস-টার্মিনাল। ময়লা-আবর্জনার উঁচু পাহাড়। নিয়তই ভাগাড়ে পরিণত হচ্ছে আমার প্রিয় গ্রাম। আমার প্রিয় আঙ্গিনা!

আর এত কিছুর জন্যে কি আমি বা আমরা কি দায়ী নই? আমরা কি ঠেকাতে চেষ্টা করছি? ঠেকাতে পারছি পরিবর্তনের এই স্যুনামিকে?

এবার একান্তই আমার নিজের কথা। যাদের আত্মিক সান্নিধ্যে আমি আমার শৈশবের, বাল্যকালের আর যৌবনের সময়টা অতিবাহিত করেছি, অপত্যস্নেহে নির্বিশেষে যাদের অকৃত্রিম আদরে, যত্নে বড় হয়ে উঠেছি সেই চেনা-মুখগুলোকে কি সচরাচর দেখতে পারবো? হাটে, বাজারে, পাঠশালায়, ধর্মীয় উপাসনালয়ে, উৎসবে, পার্বণে যাদের উজ্জ্বল-উপস্থিতিতে আমি প্রাণিত হয়েছি। ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, আর কুশল বিনিময় করেছি, এই প্রবাসে আসার পর তারা অনেকেই গত হয়েছেন। আর যারা এখনও বেঁচেবর্তে আছেন, তাদের সাথে কি সহসাই আবার সাক্ষাৎ করতে পারবো? আমাদের যুব সমাজ কী নিয়ে উদ্দীপ্ত হবে? আমরা কে কখন, কোথায় কী ভাবে মারা যাবো, তা কি জানতে পারবো? আমাদের শেষ-দেখা কি আর হবে? এই দৃশ্য বড়ই করুণ! বড়ই

বেদনার! এখন দেখছি, আমাদের নিমজ্জমান ভবিষ্যতের গতিপথ একরাশ হতাশায় আর অন্ধকারে পরিপূর্ণ!

আমি আমার গ্রামের, এলাকার এবং দেশের সব মানুষের কাছেই ঋণী। ক্রমবর্ধমান আমার এ ঋণের দায় কখনও আমি পরিশোধ করতে পারবো না। ছোট বেলায় সাথীদের সাথে বিবাদ করেছি। কাঠের শ্লেট মেরে কারও মাথা রক্তাক্ত করছি। রাগের মাথায় কারও কপাল গাল মুখ আঁচড়ে দিয়েছি। ধূলিময় রাস্তার মাঝে কাউকে চিৎ ক'রে শুইয়ে তার বুকের উপর চেপে বসেছি। বিনিময়ে মায়ের, দাদীর ও শিক্ষিকাদের দেয়া শাস্তিও ভোগ করেছি অবলীলায়। বিদ্যালয়-মাঠের পরিসরে উত্তর বনাম দক্ষিণ দলে বিভক্ত হয়ে ঝগড়া করেছি। ভাঙ্গা ইটের টুকরা আর মাটির ঢেলা ছোড়াছুড়ি করেছি। একদল আরেক দলকে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া করেছি। তোমরা আমার আশৈশব বন্ধু যারা, আমার কৃত এই সমস্ত কর্মের শিকার, অতীতের সেই সমস্ত ঘটনা কি তোমাদের স্থবির-স্মৃতিতে সাড়া জাগায়? বস্তুতঃ আমার কোন সদিচ্ছাই এই আমার কোন কাজে প্রতিফলিত হয়নি। মোটকথা, আমার স্বপ্ন অদ্যাবধি বাস্তবায়িত হয়নি। সব কিছুতে আমার অবহেলা, ব্যর্থতা প্রকট জ্বলজ্বলে রক্তময় ক্ষত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এ সমস্তই আমার গ্লানির কারণ। কারণ, আমি আগাগোড়াই অমনোযোগী এবং দুর্বিনীত চরিত্রের মানুষ। এখন এসমস্ত দুঃসহ স্মৃতির ভারে অবসন্ন আমি। ক্লান্ত আমি!

তাই এখন এই পরিস্থিতিতে নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হয়। আমার এ সমস্ত কৃত ভুলের জন্যে ক্ষমাও চাইতে ইচ্ছে করে। আমার সব ভুল আর অপরাধের কথা স্মরণ করে এই আমি করজোড়ে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে আমার যত গ্লানিমোচন প্রার্থনা করছি। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকা ও গুরুজনদের উত্তক্ত করেছি। আজ স্বর্গীয় ও জীবিত তাদের সকলের কাছে আমি বিনম্র চিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তবুও আমি সামনের ক্ষীণ-আলোকচ্ছটাকে সামনে রেখে আশাবাদী হতে চেষ্টা করি। যে কোন বড়-পরিবর্তনই শুরুতে মনকে বেদনাহত করে। মানুষকে নিকট ও সুদূর অতীতে নিয়ে যেতে চায় তার আগের মধুর স্মৃতিময়-দিনগুলো! তারপরও আশায় বুক বাঁধা হয়। মানুষকে পরিবর্তনের স্রোতের সাথে একাত্ব হতে হয়। বর্তমানের সঙ্গে নিজেকে, নিজেদের মানিয়ে নিতে হয়।

বিশ্বের সব কিছুর সাথে আমার চরিত্রেও আজ পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। এখন অভূতপূর্ব এবং অনিবার্য পরিবর্তনের স্রোতের মুখে দাঁড়িয়ে, তাই সকলের কাছে বিনীতচিত্তে বলছি, ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর...! ❑

ছোটবেলার ইস্টার পার্বণের আনন্দময় স্মৃতি

জেমস গমেজ (আদি)

বড়দিনের আনন্দ উৎসব শেষ হতে না হতে এসে গেল প্রায়শ্চিত্তকাল। ভস্ম বুধবারে গির্জায় গেলাম কপালে ছাই নিলাম, সেই সাথে ফাদারের উপদেশ নীরবে অনুধ্যান করতে লাগলাম। প্রায়শ্চিত্তকালে কি কি ত্যাগ করব তা নিয়ে একটু ভাবলাম এবং বাস্তবে তা রূপ দিতে চেষ্টা করব। জীবনে যতটা বয়স বাড়ছে মনে হয় ধর্মের অনুরাগী এবং উপোস আগের চেয়ে একটু বেশি সময় দিতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমার মনে হয় এটাই বাস্তব।

মাকে হারিয়েছি আটাশ বছর আর বাবাকে হারিয়েছি গত বছর। গত বড়দিনে বাবা ও মার অনুপস্থিতি বিশাল অনুভব করেছি। গত ২৪ ডিসেম্বর আমার ছোটভাই অলড্রিন ও ন্যান্সীদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম বড়দিন উৎসব পালন করতে। সেখানে আমরা সাত ভাই ও তাদের পরিবার এবং সকল সন্তানদের নিয়ে বেশ আনন্দ ফূর্তি করেছিলাম। আমার ছেলে খ্রীষ্টফারের জন্মদিন ছিল বলে ভাই অলড্রিন কেক এনে আনন্দ উৎসব বেশ ভালোই জমেছিল। এরই মাঝে কেন যেন মনে হচ্ছিল কোথায় যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। সকল ভাইয়েরা একসাথে জড়ো হয়ে আলোচনা করছিলাম এটাই আমাদের প্রথম বড়দিন বাবা-মা ছাড়া। তাই যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। বাবা-মার অনুপস্থিতি বিশেষ করে পালা-পার্বণে বেশ মনে পড়িয়ে দেয়।

সামনে ইস্টার-পাস্কা পার্বণ আসছে। আমাকে কেন যেন জীবনের স্মৃতির এ্যালবামে বেশ পিছু টানছে। সেই ছোট বেলার ইস্টার পার্বণের আনন্দময় স্মৃতি গুলো বেশ মনে পড়ছে। আমি কিছু সময়ের জন্য হারিয়ে গেলাম স্মৃতির পাতায়।

বাংলাদেশে আমাদের বাড়ী ছিল ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট দক্ষিণ কাফরুলে এবং গ্রামের বাড়ী গোল্লা মিশনের ছোট গোল্লা এবং মামার বাড়ী বড় গোল্লা গ্রামে। স্কুলের ছুটি কম থাকায় ইস্টার আমরা বেশির ভাগ সময়ে কাফরুলে উদ্‌যাপন করতাম।

বাবা-মার বেশ স্মৃতি মনে পড়ছে তা আপনাদের সাথে সহভাগিতা করছি। আমরা সাত ভাই এবং মা-বাবা নিয়ে বেশ বড় সংসার, তথাপিও বাবা সর্বদাই পাল-পার্বণে আমাদের সকলকে নতুন কাপড় কিনে অথবা দর্জি দিয়ে বানিয়ে দিতেন। ইস্টারে বাবা সর্বদাই কাকা ও মাসীদের নিমন্ত্রণ দিতেন, কাজেই আমাদের বাড়িতে বেশ আনন্দ ফূর্তি ও হৈ চৈ হতো। পুণ্য শনিবার রাত্রে এবং ইস্টারের সকালে উভয় মিশাতে অংশ নিতাম। তৎকালীন কাফরুল ছিল তেঁজগাও ধর্মপল্লীর উপ-ধর্মপল্লী, কাজেই কাফরুলের সেন্ট লরেন্স চার্চে কোন স্থায়ী ফাদার থাকতেন না। সেই কারণে বনানী সেমিনারী থেকে ফাদার পলিনুস কস্তা, ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা এবং ফাদার বার্নাড পালমা পালাক্রমে কাফরুলে এসে মিশা দিতেন। এই ফাদারদের উপদেশগুলো এখনো কানে ভাসে বিশেষ করে ফাদার ফ্রান্সিস গমেজ সীমা খুব ভক্তি ও আধ্যাত্মিকমূলক আর ফাদার বার্নাড পালমা বিশেষ করে কবি রবি ঠাকুরের গল্প ও কবিতা থেকে উপমা দিতেন। কাফরুলের সেন্ট পল্‌স ক্লাবের গানের কণ্ঠ আমি এখনো ভুলতে পারি না। তৎকালীন কাফরুলে অল্প কিছু দিনের জন্য কমল রড্রিক্স, দিপক বোস, কনস্ট্যান্ট ভানু গমেজ, স্বপন গাব্রিয়েল গমেজ, রবিন গমেজ, শিল্পী গমেজ, তপন গমেজ ও পলাশ গমেজের কণ্ঠে মিশার গান গুলো বেশ জমজমাট ছিল। আমরা রাত্রে এবং সকালের মিশাতে অংশ নিতাম। সকালের মিশার পর বাড়ীতে আসলে মার ভূমিকা ছিল বেশ বড় আকারের কারণ তাকে রান্না করতে হতো অনেকের জন্য। আমার ছোট দুই মাসী সকাল সকাল ফার্মগেট থেকে এসে মাকে রান্নাতে সহযোগিতা করতেন। মায়ের হাতের রান্নাগুলো এখনো ভুলতে পারছি না, বিশেষ করে আঠারো গ্রামের স্থানীয় খাবারগুলো। তন্মধ্যে শুকরের মাংসের ভুনা, বিন্দালু, মাছের ভাজা-কারি, কালদো কারি, চুকা, সুস্বাদু খাবারগুলো মা রান্না করতেন। বাবা গ্রামের বান্দুরা বাজার থেকে আনতেন খই আর বিখ্যাত সহদেবের শান্তি মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে রসগোল্লা ও অন্যান্য মিষ্টি। পরিবার সকলে মিলে এক সাথে বসে ইস্টারে দুপুরের সুস্বাদু খাবারগুলো তৃপ্তি ভরে খেতাম। ইস্টারের আনন্দ অনেক মজা হতো।

জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছি। নিজের সংসার আছে। সংসার, কাজকর্ম, সামাজিকতার পাশাপাশি যখন একটু ক্লান্ত হয়ে যাই, মাঝে মধ্যে মনে পড়ে যায় আমার সেই ছোট্ট বেলার হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি গুলো। ভাবি সেই দিনগুলো ছিল সোনালী, আবার যদি ফিরে পেতাম কতই না মধুর হতো। সেই সব সোনালী দিনগুলো এখন শুধু হৃদয়ের স্মৃতির এ্যালবামে থেকেই দেখি আর আফসোস করি। সবাইকে পাস্কা পর্বের শুভেচ্ছা॥ ❑

নিয়মিত কলাম

সেদিনের গল্পকথা

হিউবার্ট অরুণ রোজারিও

কালের সাক্ষী পবিত্র ক্রুশ ক্যাথিড্রাল

ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে ৩,৪০০ হাজার বর্গমাইল জুড়ে অবস্থিত পর্তুগাল। এই ছোট দেশটাই সে সময় ইউরোপের বাইরে নানা দেশ দখল করে তাদের প্রশাসন বিস্তৃত করেছিল। কাথলিক খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার করে উপনিবেশ তৈরী করতে সফল হয়েছিল। বিশপ আগষ্টিন যোসেফ লুয়াজ সিএসসি ছিলেন ঢাকার প্রথম বিশপ। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত ধর্মীয় প্রশাসন চালিয়েছেন, সে সময়ে অর্থাৎ ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা ধর্মপ্রদেশ পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের আমেরিকান, কানাডিয়ান ও ফরাসী মিশনারীগণ পরিচালনা করতেন। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীবাজারে পবিত্র ক্রুশ গির্জাটি নির্মিত হয়। ১৬২৮ থেকে ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পর্তুগীজ আগষ্টিনিয়ান ফাদারগণ, গোয়া ও মাইলাপুর বিশপের অধীনে ঢাকায় বাণীপ্রচার করেছিলেন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ কলিকাতাকে সদর দপ্তর করে সরাসরি রোমের সাথে বঙ্গীয় এ্যাপস্টলিক প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ বিশপ দুৎফাল ঢাকায় একটি গির্জা নির্মাণ করেন, সেটা ছিল বর্তমান সেন্ট জেভিয়ার্স হাইস্কুল। তখন বেশিরভাগ খ্রিস্টভক্ত ছিল ইউরোপিয়ান এবং এ্যাংলো। সরকারী কর্মকর্তারা প্রায় সবাই খ্রিস্টান ছিলেন। তারা সকলে লক্ষ্মীবাজার গির্জায় উপাসনা করতেন। তাদের একটি এলিট ক্যয়ার গ্রুপ ছিল। তারা রোববারে এবং পর্বদিনে গান পরিবেশনা করতেন। ইউরোপীয়ান কর্মকর্তারা সব সময় গির্জায় বিভিন্নভাবে সাহায্য সহায়তা করতেন।

১৮৮৮ পর্যন্ত ঢাকার সবচেয়ে সম্পদশালীদের মধ্যে ছিল বৃটিশ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও প্রটেস্ট্যাণ্টগণ, কিছু সংখ্যক আর্মেনিয়ান এবং কিছু গ্রীক খ্রিস্টান। ঢাকা শহরের অধিকাংশ জমি তাদের মালিকানায় ছিল। ঢাকার পবিত্র ক্রুশ গির্জায় মেঝের সারিতে কোন বাঙ্গালী খ্রিস্টভক্ত বসতে পারত না। ইংরেজ ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা বসতে পারত। তারা নিজেদের নাম ফলক দিয়ে তা সংরক্ষণ করতেন। তাদের সন্তানদের পড়াশুনার জন্য সেন্ট গ্রেগরী স্কুল ও ফ্রান্সিস জেভিয়ার গার্লস স্কুল দুটি, ফাদার গ্রেগরী গুজ নির্মাণ করেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেশী বাঙ্গালী হিন্দু, মুসলমান ছাত্র ছাত্রীরা সেখানে পড়াশুনার সুযোগ পায়। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুলে গঠিত লক্ষ্মীবাজারের গির্জাটি ঘূর্ণিঝড়ে বিনষ্ট হয়ে যায়।

বেনিডিক্টান ফাদারদের অধীনে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র ক্রুশ ক্যাথিড্রালটি নির্মিত হয়। ২ বছর পরে লক্ষ্মীবাজারের গির্জাটিই ক্যাথিড্রাল গির্জায় উন্নীত করে নামকরণ করা হয় পবিত্র ক্রুশ ক্যাথিড্রাল। পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের আমেরিকান ও কানাডীয় ফাদারগণ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে পোপীয় আদেশে রমনার সেন্ট মেরীস গির্জাটিকে ক্যাথিড্রাল গির্জায় উন্নত করেন, সঙ্গতশারণে লক্ষ্মীবাজারে গির্জাটি সাধারণ গির্জা হিসাবে পরিণত হয়। এই লক্ষ্মীবাজার গির্জায় তিনজন বিশপ সমাহিত হন; বিশপ লুয়াজ, বিশপ ফ্রান্সিস ফ্রেডরীক ও বিশপ তিমথী ক্রাউলি সেই স্থানে সমাহিত হয়েছেন। লক্ষ্মীবাজার ক্যাথিড্রালে ফাদার জন ক্রাউলী ও বিশপ লরেন্স গ্রেনার বিশপীয় পদে অধিষ্ঠিত হন ।

লক্ষ্মীবাজার ক্যাথিড্রালের অধীন আমপট্রিতে একটি অনুগির্জা ও মিশনারীজ অব চ্যারিটির শিশু ভবন রয়েছে। ঢাকা ক্রেডিটের অফিস, প্যারিস কাউন্সিল, কুমারী মারীয়ার সেনাসংঘ লক্ষ্মীবাজার ক্রেডিট ইউনিয়ন, খ্রীষ্টান হাউজিং সোসাইটি, খ্রীষ্টান মহিলা সমিতি ও যুবক যুবতীদের সাংস্কৃতিক সংঘ, সুহৃদ সংঘ বিদ্যমান। খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র তাদের খ্রিস্টান প্রিন্টিং প্রেস নিয়ে, বাণীদিপ্তী রেকর্ডিং স্টুডিও নিয়ে আছে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে রমনার সেন্ট মেরীস গির্জাটিকে নতুন ক্যাথিড্রাল করা হয়।

বর্তমানে পবিত্র ক্রুশ গির্জায় সকলেই বাঙ্গালী। খ্রিস্টভক্ত, যুবক যুবতীদের একটি ক্যয়ার গ্রুপ রয়েছে। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে লক্ষ্মীবাজার গির্জার পালক ফাদার যোসেফ দত্ত গির্জা প্রাঙ্গণে ধন্যা কুমারী মারীয়ার গ্রোটোটি নির্মাণ করেন, গ্রোটোর সাথেই ফাদার দত্তকে সমাধি দেয়া হয়।

খ্রিস্টের আদর্শ ও বাণী প্রচারে বিশপ লুয়াজ, বিশপ আর্ত, বিশপ লিনবোর্ন, বিশপ যোসেফ ল্যগ্রা, বিশপ তিমথী ক্রাউলী, প্রথম আর্চবিশপ লরেন্স গ্রেনার, আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস গাঙ্গুলী, আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, লক্ষ্মীবাজার কাথিড্রালে সেবা দিয়ে খ্রিস্টের বাণীকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। বিশপগণ ও ফাদারগণ অসাধারণ দক্ষতায় শিক্ষা, চিকিৎসা সেবায় সমাদৃত। সুখবর হচ্ছে যে, বর্তমানে কিছু ফাদার, ব্রাদার সিস্টারগণ মিশনারী হিসাবে বিদেশে যাচ্ছেন বাণী প্রচার ও পালকীয় কাজ করতে।

ফাদার চার্লস ইয়াং সিএসসি এই লক্ষ্মীবাজার ক্যাথিড্রালের পার্লারে দেশের সমবায়ী আন্দোলন শুরু করেন এবং ঢাকা ক্রেডিট গঠন করেন। ধর্মপল্লীর মাত্র ১৫ জন সদ্যসদের নিয়ে। সেই আর্থ-সামাজিক ক্রেডিট ইউনিয়ন এখন দেশে সর্ববৃহৎ ক্রেডিট ইউনিয়ন।

সূত্রঃ

১। **যেরুম ডি' কস্তা,** বাংলাদেশে ক্যাথলিক মণ্ডলী

২। **ফাদার রিচার্ড টিম সিএসসি,** Father of the credit union in Bangladesh: Life of Father C.J Young, csc

সময়

বেঞ্জামিন গমেজ

ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে এগিয়ে চলছে বিরতিহীনভাবে, থামছে না এক মুহূর্তের জন্য। বিছানায় শুয়ে আছি, পাশে স্ত্রী অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে, এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ঘড়ির দিকে আর ভাবছি, "সময় চলতে থাকে তার নিজস্ব গতিতে, কেউ সময়কে থামাতে পারে না, নিয়ন্ত্রণও করতে পারে না। বরং সময়ই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আসলে মানুষই সময়ের অধীন। তাই সময়কে সঠিকভাবে ব্যবহার করে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হয় এবং লক্ষ্যপথে পৌঁছতে হয়। আজ যেন ঘভীরভাবে ভাবছি আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি সময়ের কতটুকু সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পেরেছি! আমারতো প্রচুর সময় ছিল, প্রয়োজনীয় সব উপকরণও আমার ছিল। সবার সহযোগিতাও ছিল। যে পরিবেশে, শিক্ষায় ও আচরণে আমি হয়েছি লালিত-পালিত, সেই তুলনায় আমার অবস্থান হওয়া উচিত ছিল আরও উন্নত মানের। জীবনের শেষ ধাপে এসে আরও ভাবছি আমার অবস্থান কোথায় থাকা উচিত ছিল, আজ আমি কোথায় আছি! ভুল পথের পথিক হয়েছি, আফশোস ভাল কিছু হতে পারলাম না, নিজের জন্য বা পরের জন্য ভাল কিছুই করতে পারলাম না। বিগত জীবনে যা কিছু করেছি, সবই বোকার মত কাজ করেছি, হয়েছি একটি বোকা মানুষ, এটা বাস্তব সত্য।

আমার আছে বিরাট উঠান বাড়ী, সকল ছেলেমেয়েদের পৃথক পৃথক ঘর, সকলেই নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করছে। বর্ষাকাল। ঘরের চালের উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ সাথে দমকা বাতাস। আজ কেন যেন ভয় ভয় লাগছে। ভয়ে কাথার নীচে চুপ করে রইলাম। হঠাৎ শুনতে পেলাম দরজায় কে যেন আঘাত করছে। ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে? উত্তর এল আমি 'সময়'। আমি তোমাকে নিতে এসেছি। আজ তোমার পরপারে যাওয়ার দিন। ভয়ের মাত্রা আরও বেড়ে গেল, শরীর কাঁপছে। আমি কম্পিত কণ্ঠে অনুরোধ করে বললাম, আমাকে আর একটু সময় দাও। আমার প্রস্তুতির দরকার আছে।

আমার অর্থ ও সম্পদ আমার ছেলে-মেয়েদের বুঝিয়ে দিতে চাই। সকলের কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে প্রস্তুত থাকতে চাই। আমার বিনীত অনুরোধে সময় আমার প্রার্থনা মনজুর করল। সময় আমাকে আরও বলল, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি চাই তোমার পরিত্রাণ। আমি আসার আগে তোমাকে বিভিন্ন চিহ্ন বা সংকেত পাঠাব তখন থেকেই তুমি প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। কথাগুলো মনে রাখবে। আমি হাত জোড় করে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, হ্যা, তোমার দয়ার কথা আমার মনে থাকবে।

দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর পার হয়ে গেল। বয়স বেড়ে গেছে, আগের মত কাজকর্ম ও চলাফেরা করতে পারি না, শরীরটা দুর্বল, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তি কমে গেছে, মাথার চুল পরে গেছে, খাওয়ায় রুচি নাই, খেতে কষ্ট হয়, কিছু খেলাম কিনা তাও মনে থাকে না। বেশির ভাগ সময়ে একাকীই বিছানে শুয়ে থাকি, কে আমার কাছে এল বা চলে গেল কিছুই বুঝতে পারি না। এক সময় টের পেলাম কে যেন আমার কাছে এসে বিড়বিড় করছে, কি যেন করবে বলে মনে হচ্ছে, ক্ষীণকণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা করলাম কে? কে? কি করছ এখানে? উত্তর এল, "আমি সময়, তোমাকে নিতে এসেছি।" আমি চমকে উঠলাম।

তখন আমার মনে পড়ল, হা, অনেক বছর আগে 'সময়' এসেছিল আমাকে নিতে, আমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, অনেক অনুরোধ করে প্রস্তুতির জন্য সময় চেয়েছিলাম, আমার প্রার্থনা মনজুর হয়েছিল। কিন্তু আমি কি করে এটা ভুলে গেলাম! এতগুলো বছর পার হয়ে গেল, আমি তো একবারও ধন্যবাদ জানালাম না, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলাম না, এতবড় দানের কোন প্রতিদানই করলাম না। আমি ভয়ে ভয়ে সময়কে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তো বলেছিলে "আমার জন্য বিভিন্ন চিহ্ন বা সংকেত পাঠাবে, কিন্তু আমি তো এসব কিছুই পাই নাই।" সময় হেসে উত্তর দিল, "আমি অনেকবার তোমাকে সতর্কমূলক চিহ্ন পাঠিয়েছি কিন্তু তুমি বুঝার চেষ্টা কর নাই।"

প্রথম চিহ্নস্বরূপ তোমার বয়স বৃদ্ধির কারণে আমি তোমার কর্মক্ষমতা কমিয়ে দিলাম যেন সতর্ক হও এবং প্রস্তুত থাক। কিন্তু তুমি তা বুঝতে পার নাই। এক সময় তোমার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণ শক্তি কমিয়ে দিলাম কিন্তু তুমি এসবকে সতর্ক চিহ্ন হিসাবে গ্রহণ করলে না। ভাল দেখার জন্য চোখে মোটা গ্লাস ও শ্রবণ শক্তির জন্য কানে দামী যন্ত্র লাগালে কিন্তু সতর্ক চিহ্নটাকে চিনলে না। এক সময় তোমার মাথার চুল সব শাদা করে দিলাম, তুমি কাল রং লাগিয়ে সকলের বাহবা পেতে লাগলে, অতপর সব চুল পড়ে গেল, কিন্তু সতর্ক হলে না। এক সময় দাঁতের যন্ত্রণা বাড়িয়ে দিলাম, এটাকেও পাত্তা দিলে না। দাত বাঁধিয়ে সবই নতুন দাঁত পেয়ে খুব মজার খাবার খেয়ে আনন্দে মেতে উঠলে। একাকী চলতে পার নাই, লাঠি ভর দিয়ে হাঁটতে, তখনও তোমার টনক নড়ে নাই। প্রয়োজনীয় সব উপকরণ ও সুযোগ অনেক পেয়েছ কিন্তু প্রতিদানে কি করেছ? তা ছাড়া পবিত্র বাইবেলে মথি ২৪:৪২ পদে উল্লেখ আছে, "তোমরা জেগেই থাক, কারণ তোমাদের প্রভু যে কবে আসবেন, তোমরা তা জান না।" আবার ২৪:৪৪ পদেও বলা হয়েছে, "তোমরা প্রস্তুত হয়েই থেকো, কারণ মানবপুত্র এমনি এক সময় আসবে, যখন তোমরা তার আসবার কথা ভাবছই না।" এসব কি কখনও পড়েছ? তারপর সময় আমাকে বলল আর কথা বাড়াব না, আজ তোমার কোন আপত্তিও শুনব না, কোন অনুরোধ রাখব না। আমি তোমাকে এক্ষুনি নিয়ে চলে যাব। চল আমার সাথে। আমি টের পেলাম, কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমি প্রচণ্ড ভয় পেলাম, আর উচ্চস্বরে চিৎকার করে সকলকে ডেকে বলতে লাগলাম, তোমরা কে কোথায় আছ, তাড়াতাড়ি আসো, কে যেন আমাকে নিয়ে যাচ্ছে! আমার চিৎকার শুনে সকলেই দৌড়ে এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল॥ ❑

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

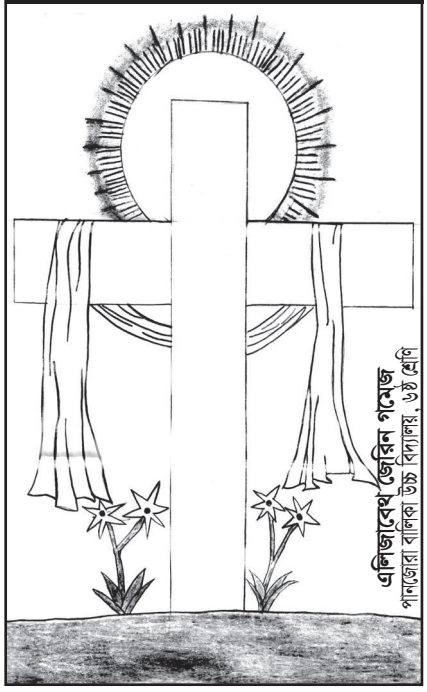

এলিজাবেথ জেরিন গমেজ
পাগাঁজোরা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ৬ষ্ঠ শ্রেণি

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

আমি নিজেও তো একজন অভিবাসীর সন্তান - পোপ ফ্রান্সিস

পানামার লাজাস ব্লান্কাতে একদল সমবেত অভিবাসীদের উদ্দেশে গত ২১ মার্চ পোপ ফ্রান্সিস এক বক্তব্য রাখেন। যেখানে তিনি ব্যক্তিগতভাবে অভিবাসীদের সঙ্গ দিতে চান এবং তাদের অবস্থা তাঁর বোধগম্য সে কথা জানান। কেননা পোপ মহোদয় নিজেই

অভিবাসীর সন্তান যারা উন্নত ভবিষ্যতের প্রত্যাশায় বেরিয়ে পরেছিল। যে সকল বিশপ ও পালকীয় কর্মীগণ অভিবাসীদের সেবা করছেন পোপ মহোদয় তাদের ধন্যবাদ দিচ্ছেন। কেননা তারা মাতা মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব করে তার ছেলে-মেয়েদের সাথে হাঁটছে। যে যাত্রার মধ্যদিয়ে মাতামণ্ডলী খ্রিস্টের মুখ আবিষ্কার করছে এবং ভেরোনিকার মত মমতা ভরে অভিবাসনের ক্রুশের যাত্রায় সান্ত্বনা ও আশা দান করছে। পুণ্যপিতা আরো বলেন, অভিবাসীরা কষ্টভোগী যিশুর দেহকে প্রতিনিধিত্ব করে যখন তারা জোরপূর্বক নিজ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, যখন তারা কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে ঝুঁকি ও বিপদ-ক্লেশের মুখোমুখি হয়েই যাত্রা শুরু করে। পোপ মহোদয় অভিবাসীদেরকে তাদের মানব মর্যাদা না ভুলতে এবং 'অন্যদের চোখে তাকাতে ভয় না পেতে' আহ্বান করেন; কেননা তারা ব্যবহার শেষে ফেলে দেবার দ্রব্য নন। তাদের মর্যাদা আছে। তিনি অভিবাসীদের আশ্বস্ত করেন যে তারাও মানব পরিবার ও ঈশ্বরের পরিবারের সন্তান।

পোপ ফ্রান্সিস সমগ্র বিশ্বের জন্য কথা বলেন - মাল্টার প্রেসিডেন্ট

গত ২২ মার্চ ভাটিকান নিউজকে সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় মাল্টার প্রেসিডেন্ট জর্জ ভেল্লা বলেন, যখন পোপ মহোদয় কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (যেমন জলবায়ু পরিবর্তন) কথা বলেন তখন তিনি সমগ্র বিশ্বকে বিবেচনা করেই তা বলেন। তা শুধু জাতীয় ইস্যু নয় বৈশ্বিক ইস্যু। তাই তিনি যখন জলবায়ু পরিবর্তন বা পরিবেশ নিয়ে কিছু বলেন তখন তা রোম বা মাল্টার ইস্যু নয় তা সমগ্র বিশ্বের। পোপ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় কি বিষয় নিয়ে কথোপকথন হয়েছে তা বিস্তারিত না বললেও অভিবাসী ও ইউক্রেন-মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ভেল্লা জোর দিয়ে বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে পোপ মহোদয়ের যে উদ্বেগ ও তা রক্ষাকল্পে যে মনোভাব তা ফ্রান্সিসকান ধারায়; কেননা আসিসির সাধু ফ্রান্সিস প্রকৃতিকে নিয়ে ঈশ্বরের প্রশংসা গান করেছেন। একইভাবে পোপ ফ্রান্সিস তাঁর 'লাউদাতো সি' সার্বজনীন পত্রের মধ্যদিয়ে প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা বলেছেন।

২০২২ খ্রিস্টাব্দে পোপ মহোদয়ের মাল্টা সফরের স্মৃতিকে স্মরণ করে প্রেসিডেন্ট ভেল্লা জানান, পুণ্যপিতা এই দ্বীপ দেশটিতে এসে সেখানে সাধু পলের সাথে দেশটির যোগসূত্রতার উপর জোর দেন। সাধু পল তাঁর প্রৈরিতিক সফরের সময় জাহাজডুবিতে মাল্টা গিয়ে বাণীপ্রচারের কাজ করেন। একজন ফ্রান্সিসকান ফাদার দ্বারা পরিচালিত শরণার্থীদের নিরাপদ আশ্রয় পোপ ত্রয়োবিংশ যোহন অভিবাসী কেন্দ্র হল ফার পোপ ফ্রান্সিস দেখতে গেলে পর যে পরিবেশ সৃষ্টি হয় তা ছিল সবচেয়ে আবেদনময়। মনে হচ্ছিল পোপ মহোদয় যেন সপ্তম স্বর্গে। তিনি সে পরিবেশ বেশ উপভোগ করছিলেন, অভিবাসীদের আলিঙ্গল করছিলেন এবং হৃদয় থেকে কথা বলছিলেন। পোপ মহোদয়ের সাথে সাক্ষাতের সময় তিনি তা স্মরণ করেন।

প্রেসিডেন্ট ভেল্লা পোপ ক্লিনিকের জন্য ছয়টি কম্পিউটার উপহার দানের কথা জানান, যেগুলো প্রায়শই ব্যবহার হবে প্রেসক্রিপশন লিখতে, স্টকগুলোর হিসাবসহ অন্যান্য হিসাব রাখতে। মানুষের আর্থিক সংকটের সময় পোপ ফ্রান্সিস মা মারীয়ার দয়া ক্লিনিক নামে তা প্রতিষ্ঠা করেন। ভাটিকানে সাধু পিতরের বাসিলিকায় ঢুকতেই বড় কলামের পাশে এই ক্লিনিকের অবস্থান। প্রেসিডেন্ট ভেল্লা এই ক্লিনিক পরিদর্শন করেন। যদিও এই ক্লিনিক বড় রোগের তেমন কোন চিকিৎসা করে না কিন্তু ছোটখাট রোগের চিকিৎসা দেয়। কিন্তু এই ক্লিনিকে কেউ গেলে অন্তত এমন কাউকে পাবে যে তাকে মানুষ হিসেবে স্বাগত জানাবে। এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একজনকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া। প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, তারা হয়তো অসুস্থতা সারিয়ে তুলে না বা কোন অলৌকিক কাজও করে না। কিন্তু সেখানে সবসময়ে একজনকে পাবে যে তাদেরকে মর্যাদার সাথে স্বাগত জানাবে, স্নান করার, চুল কাটার, দাঁত দেখার বা স্বাভাবিক চেক আপ করার সুযোগ দেবে। আর এইভাবেই দয়ার কাজে বাস্তব অনুশীলনী হয়॥

- তথ্যসূত্র : news.va

মস্কোতে সন্ত্রাসী হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য পোপ মহোদয়ের প্রার্থনা

তালপত্র রবিবারে সাধু পিতরের চত্বরে পোপ ফ্রান্সিস

গত ২২ মার্চ রোজ শুক্রবার সন্ধ্যায় মস্কোর ক্রোকাস হল কনসার্ট ভেন্যু ও শপিং কমপ্লেক্সে জঘণ্য সন্ত্রাসী হামলায় ১৩৩ জনের প্রাণহানি ঘটে এবং আরো শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। হামলাকারীরা বিস্ফোরক ডিভাইস স্থাপন করে যা অনুষ্ঠানস্থলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সন্ত্রাসী হামলায় নিহত-আহতদের মঙ্গল কামনা করে পোপ মহোদয় তালপত্র রবিবারে সাধু পিতরের চত্বরে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গের সময় তাদের স্মরণ করে বিশেষ প্রার্থনা করেন এবং তাঁর প্রার্থনার আশ্বাস দেন। যারা মৃত্যুবরণ করেছেন ঈশ্বর তাদের অনন্ত শান্তি দান করুন এবং তাদের পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেন। সকল মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বর শান্তি দান করুন। যারা এই সন্ত্রাসী ও অমানবিক কাজের পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন করেছে ঈশ্বর তাদের সকলের মনের পরিবর্তন ঘটাক। আইএস এ হামলার দায় স্বীকার করেছে। রুশ কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে, যাদের মধ্যে ৪জন অস্ত্রধারীও রয়েছে।

তালপত্র রবিবারের দূত সংবাদ প্রার্থনায় পুণ্যপিতা যুদ্ধের কারণে যারা কষ্টের মধ্যে রয়েছে তাদের সকলের জন্যে প্রার্থনা করেন, বিশেষভাবে ক্ষতবিক্ষত ইউক্রেনের জন্য। তিনি বলেন, তীব্র হামলা করে অবকাঠামো ধ্বংস করে দেবার ফলে অনেক মানুষ ইলেকট্রিসিটি বিহীন দিনাতিপাত করছে, যা মৃত্যু যন্ত্রণা ছাড়াও মানবিক বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই দয়া করে ইউক্রেনকে ভুলে যাবেন না এবং গাজাসহ যুদ্ধ বিধ্বস্ত সকল স্থানের মানুষকে প্রার্থনার স্মরণ করুন। পুনরুত্থানের দিকে আমাদের যাত্রা তাতে বিশ্বাস রেখে আমরা পুণ্য সপ্তাহে প্রবেশ করি এবং কুমারী মারীয়ার সাথে পথ চলি যিনি আমাদেরকে যিশুর কাছে নিয়ে যাবেন। যেখানে গিয়ে আমরা পুনরুত্থানের আনন্দ লাভ করবো।

মহান খ্রিস্টের গৌরবময় পুনরুত্থান উপলক্ষে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী এর পাঠক-পাঠিকাসহ সকলকে কারিতাস জানাচ্ছে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

- কারিতাস অর্থ "দয়ার কাজ" বা "সর্বজনীন ভালোবাসা"।
- কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার আলোকে কারিতাস বাংলাদেশ এমন একটি সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন লালন করে, যে সমাজ মুক্তি ও ন্যায্যতা, শান্তি ও ক্ষমাশীলতার মূল্যবোধসমূহকে ধারণ করে এবং সবাই মিলে পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্মানের সাথে মিলন সমাজে বসবাস করে।
- কারিতাস বাংলাদেশ মানুষের সহযোগী হতে চায়; বিশেষতঃ সেইসব মানুষের – যারা সমাজে গরীব ও প্রান্তিক জীবনাবস্থায় আছে। সবার প্রতি সম-মর্যাদার দ্বারা কারিতাস এমন একটি সমন্বিত উন্নয়ন অর্জন করতে প্রয়াসী যার লক্ষ্য হলোঃ মানব-মর্যাদা নিয়ে মানুষ সত্যিকার মানুষের মতো জীবন যাপন করবে এবং অপরকে দায়িত্বশীলতার সাথে সেবা করবে।
- জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কারিতাস সকল মানুষের সাথে কাজ করে।

কারিতাস বাংলাদেশ

২ আউটার সার্কুলার রোড

শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭

প্রয়াত সনেট ডানিয়েল গমেজ

জন্ম: ৫ অক্টোবর, ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ১৯ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: রাজনগর, রাঙ্গামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

"সংসারের মায়া ছেড়ে আজিকে গেল যে জন
দাও প্রভু দাও তারে অনন্ত জীবন।"

আমাদের অত্যন্ত প্রাণপ্রিয় বুকের ধন সনেট ডানিয়েল গমেজ মাত্র ৩৭ বছর বয়সে বিদেশ থাকাকালীন অবস্থায় গত ১৯ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে আমাদেরকে শোক সাগরে ভাসিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ব্যক্তিগত জীবনে সে ছিল অত্যন্ত সৎ, বিনয়ী, ধর্মভীরু, সদালোপী, কর্মঠ, শান্তিপ্রিয় ও পরোপকারী ব্যক্তি।

শেষকৃত অনুষ্ঠানে আমার ছেলের পাশে থেকে যারা প্রার্থনা, সান্ত্বনা ও নানাভাবে সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। তার বিয়োগ ব্যথা আমাদের হৃদয়ে গভীরে বিচ্ছেদের ছেদ সৃষ্টি করেছে। তার অভাব আমাদের করেছে দিশেহারা। কিন্তু মৃত্যু তোমাকে ছিন্ন করতে পারেনি আমাদের কাছ থেকে। তোমার আদর্শ, তোমার পথ চলা, তোমার প্রার্থনা-ভক্তি, সমাজের প্রতি তোমার কর্তব্যনিষ্ঠা, আমাদের করে সবসময় অনুপ্রাণীত।

পরম পিতার আশ্রয়ে স্বর্গধামে তুমি থাক চির সুখে। এই প্রার্থনা করি।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে –
বাবা : অতুল গমেজ
মা : স্বর্ণ গমেজ
স্ত্রী : লাবনী গমেজ
ছেলে : লিয়াম গমেজ
মেয়ে : মিশেল গমেজ
বোন জামাই : লিয়ওন কস্তা
বোন : লিনেট কস্তা
ভাগিনী : রেইনা কস্তা
দিদিমা : ষ্টেল্লা রিবেরু
ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন
গ্রাম: রাজানগর, রাঙ্গামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন (যোহন ১১:২৫)

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে, ...
যখন জমবে ধূলা তানপুরাটার তারগুলায়, ...
তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি। - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাবা, নিরালায় নিভৃতে বসে নীরবে শুনি তোমার মধুর কণ্ঠে গেয়ে যাওয়া কত গান।
বাতাসে ধ্বনিত রণিত কত কথা, পথ চেয়ে দেখি মন্থর গতিতে হেঁটে চলার অপূর্ব ছবি।
কে বলে তুমি নেই? তুমি রয়েছ আমাদের হৃদয় গভীরে।
তোমার পদচিহ্ন, হাতের ছোঁয়া, মধুর দৃষ্টি- সে তো চির জাগ্রত, চির জীবন্ত নীলাকাশের উজ্জ্বল তারার মত।
স্বর্গরাজ্যে তুমি রয়েছ্ পবিত্র ত্রিত্বের জয়গানে চির মুখরিত।
বাবা, তুমি মাকে ও তোমার সন্তানদের, নাতি-নাতনীদের, পুতি-পুতিনদের ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করো।

আর্নেষ্ট আলম ডি. কস্তা
সূর্যোদয় : ১ মার্চ, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
সূর্যাস্ত : ১২ এপ্রিল, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ

স্ত্রী	:	ফিলোমিনা নির্মলা গমেজ
ছেলে ও বৌমা	:	লরেন্স ডি. কস্তা ও এলিজাবেথ গমেজ
ছেলে	:	পঙ্কজ ডি. কস্তা
মেয়ে ও জামাই	:	ঊষা-প্রয়াত নিকোলাস, রীনা-সুশীল, শুভ্রা- জেমস, শিখা-সুজিত, সিম্মি- ডেনিস
মেয়ে	:	সিস্টার রেবা আরএনডিএম এবং সিস্টার মেরী আভা এসএমআরএ
নাতি-নাতবৌ	:	রুজভেল্ট-লিরা, ভিক্টর-রিমি, সুমন-প্রিয়াংকা, ব্লেইজ-মুমু, সুজন-সুইটি, প্রিন্স-পূজা, জেরী-কৃণা, জেসী-জিনা
নাতি-নাতনী	:	কেলভিন, খ্রীষ্টফার, এলিসন, ম্যাথিও, ইভা, এমা, মারিসা, জেইডা, জেইক
পুতি-পুতিন	:	হৃদী, ক্লেইন, রাহী, এইডেন, নিকসন, অদ্রি, লিয়া, এলাইনা, ব্রকলিন, এলা, নায়া, জিয়ানা

526 Abbey fields loop, Morrisville, NC 27560

Achievement/কৃতিত্ব

Sunny John Rebeiro, our Shining Star, with wisdom and courage, you've come so far. Your graduation day a triumph well-deserved and your journey of growth and knowledge has reached a new chapter filled with endless possibilities. Embrace the future with joy in your heart, let your dreams and talents set you apart.

অতি আনন্দ ও গর্বের সাথে জানাচ্ছি যে, আমাদের সন্তান সানি জন রিবেরু, Full Sail University, Florida, USA, Bachelors of Science in Recording Arts Minored in Tele- Communications সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করেছে। আমরা তার এ সাফল্যের জন্য ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই এবং সকলের কাছে তার দীর্ঘ জীবন ও ভবিষ্যতে আরও সাফ্যল্যের জন্য আশীর্বাদ কামনা করি।

পিতা: ফ্রান্সিস রিবেরু, মাতা: আল্পনা রিবেরু
দিদি-দুলাভাই: ডায়না ও রনি গমেজ
ঠাকুর মা: জিতা রিবেরু, দাদা-দিদিমা, কাকা-কাকীমা
মামা-মামী, পিসিগণ ও মাসীগণ

সবাইকে জানাই পাস্কা ও বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বিনিয়োগ সমৃদ্ধির প্রথম পদক্ষেপ, স্বাবলম্বী হোন, অধিক মুনাফা অর্জন করুন!!

স্থায়ী আমানত

৫½ বছরে দ্বিগুণ

৯½ বছরে তিনগুণ

৫ বৎসর	৪ বৎসর	৩ বৎসর	২ বৎসর	১ বৎসর	৬ মাস
১৩.৫০%	১৩.০০%	১২.৫০%	১২.০০%	১১.০০%	১০.০০%

সঞ্চয়ী	ডিপোজিট / এল.টি
৬.০০%	৫.০০%

+ ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.০০%।
+ ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর মাসিক ১,০২৫/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৩০%।
+ ৩ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,০৫০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.২০%।
+ ৫ বৎসর মেয়াদী ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকার মেয়াদী আমানতের উপর তিন মাস অন্তর ৩,১০০/= টাকা হারে সুদ প্রদান করা হবে। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর আসল টাকা। সুদের হার ১২.৪০%।

SHORT TERM HDPS

One Year		Two Years		Three Years	
Total Deposit (1,000 X 12)	12,000/=	Total Deposit (1,000 X 24)	24,000/=	Total Deposit (1,000 X 36)	36,000/=
Interest 9%	585/=	Interest 9.50%	2,375/=	Interest 9.75%	5,411/=
Bonus (If Regular)	500/=	Bonus (If Regular)	1,000/=	Bonus (If Regular)	1,500/=
Amount Payable	13,085/=	Amount Payable	27,375/=	Amount Payable	42,911/=

MILLIONAIRE SCHEME

Monthly Installment	Total Deposit Amount	Total Benefit	Total Amount
3 Year			
23,850/=	858,600/=	1,41,400/=	1,000,000/=
5 Year			
12,900/=	774,000/=	2,26,000/=	1,000,000/=
10 Year			
4,850/=	582,000/=	4,18,000/=	1,000,000/=
12 Year			
3,700/=	532,800/=	4,67,200/=	1,000,000/=
15 Year			
2,630/=	473,400/=	5,26,600/=	1,000,000/=

আগস্টিন পিউরীফিকেশন
চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা কমিটি

ইমানুয়েল বাপ্পী মন্ডল
সেক্রেটারি, ব্যবস্থাপনা কমিটি

দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ
THE METROPOLITAN CHRISTIAN CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
Regd. No. 282 Dated 06.06.0978

আর্চবিশপ মাইকেল ভবন, ১১৬/১, মনিপুরীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ +৮৮ ০২ ৫৫০২৭৬৯১-৯৪ info@mcchsl.org www.mcchsl.org

BOOK POST

Michael Andrew Atul Gomes

29 January 1940 - 03 January 2024

Born: Juma Pramanick Barie
Kashinogore, Golla, Dhaka
Parents: Joseph and Anna Gomes Pramanick
Career: United States Information Service, Barisal
Fischer Bearing Corp. Stratford, Ontario, Canda.

Life long hard working man. Honest as ever. Dedicated husband and father. And now this vast emptiness. Our lives will not be the same again. In Resurrection we trust. Requescat In Pacem.

Wife: Agnes Gomes (Ikrashi)
Children: Michael Rex Gomes Jr.
Agnes Gomes Koizumi
Treanne Gomes Roberts
Grandson: Jude Michael Roberts
Boudi: Mary Sandhya Gomes
Sister: Mary Jyotsna Gomes
Brother: PC Gomes, P. Eng./Maya Anjous Gomes

Graceful Easter To All

চলতি সংখ্যার মূল্য ৩০ টাকা মাত্র

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre
61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885
Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100
Phone : 47113885, E-Mail : wklypratibeshi@gmail.com, Web: www.weekly.pratibeshi.org